কৌতুক-যৌতুক

সন্তোষকুমার দে

পি. কে. বসু য়্যাণ্ড কোং
কলিকাতা—৩১

বয়স্কদের হাতে

এই লেখকের ঃ

গল্প-উপন্যাস

স্ট্রাইক

পাণ্ডুলিপি

পরিচয় (যন্ত্রস্থ)

প্রবন্ধ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন

নাটিকা

১৩৫০ সাল

কবিতা

পরিণয় (যন্ত্রস্থ)

ব্রাদার

পাশাপাশি বেঞ্চিতে বসে থাকলেও এতক্ষণ তাঁর সঙ্গে আলাপ জমাতে পারি নি। আন্দাজে বুঝছিলাম, ভদ্রলোক মৌতাতে আছেন, এবার মনে হল তন্দ্রা ভেঙেছে। হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বল্লেন—হরি বল, হরি বল। কথাটা শোনালো হরিবল্ (Horrible), খটকা লাগলো কানে। ঠাট্টা করছেন, না সত্যি horrible বলছেন? গরম পড়েছে অবিশ্যি, তা শ্রাবণ মাসের মেঘ-ভাঙা রোদে এমন গরম মাসে পনের দিন লেগেই আছে। আর ভিড়ের কথা যদি বলেন তবে তো বলতেই হয় যুদ্ধের আগেও আমাদের এই একশো এগারো নম্বরের গাড়িতে ভিড় কম ছিল কবে? ওটা আমাদের গা-সহা হয়ে গেছে। তবু বৃদ্ধমানুষের মুখে horrible! হবেও বা, যুগধর্ম।

দাদা এবার আমার দিকে তাকালেন, বল্লেন, বিড়ি আছে নাকি ব্রাদার?

এমন মধুর আপ্যায়নেও কিন্তু বিড়ি দিতে পারলাম না। দেখুন, গদ্য কবিতা লিখতে শিখেছি, সিনেমায় বসে শিস দিতে শিখেছি, চলন্ত ট্রাম থেকে টিকিট না দিয়ে নেমে যেতে শিখেছি, কিন্তু বিড়ির ধোঁয়াটা মগজে এখনো সহ্য করতে পারি নি। দুঃখ প্রকাশ করলাম। দাদা আবার হাই তুললেন, তারপর বল্লেন—এটা কোন্ টিশন যাচ্ছে ব্রাদার?

আবার সেই মধুর সম্ভাষণ! যে স্টেশন মনে এলো বলে ফেল্লাম; কিন্তু হিসেবে ভুল হয়ে গেল। আমরা ঈস্টর্ণ রেলে চড়ে বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি, শ্বশুরের শ্বশুরবাড়ি—সর্বত্র যাতায়াত করি, সুতরাং ফস্ করে মুখ দিয়ে রাণাঘাট কিংবা বনগাঁ বেরিয়ে গেলে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমার গন্তব্য স্থান পুরী, দাদার গন্তব্য কোথায় এখনো জানা হয় নি।

টিশনের নাম শুনে দাদা হেসে বল্লেন, রাঁচি চলেছেন নাকি?

আমি বল্লাম—না তো, পুরী।

দাদা বল্লেন, ঐ একই কথা ব্রাদার। রাঁচিতে যাওয়াই ভালো ছিল।

আমার একটা দুর্বলতা আছে। আমি এম-এ পাশ করতে পারি নি। তিন তিনবার চেস্টা করেছিলাম, একবার অঙ্কে, একবার ইংরাজীতে, একবার এনথ্রোপোলজিতে। ফলে কোনো বিষয়ের উপরেই অধিকার জন্মায় নি। শেষ পর্যন্ত এম-এ না হতে পেরে এম-বি হয়েছি। এম-বি অর্থে মাস্টার অব বয়েজ, কর্পোরেশনের বিনাপয়সার ইস্কুলে বালক পড়াই।

দাদা কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন—কি করা হয়?

বল্লাম, আমি এম-বি। আর আপনি?

অম্লান বদনে দাদা বল্লেন—এম-এ-ডি (M A D)

সেটা কোন্ ডিগ্রি, নিশ্চয় বড়োরকম কিছু। ভাবতে লাগলাম—এম-এ-ডি, এম-এ-ডি। আমার চিন্তান্বিত চেহারার দিকটা অনুমান করে দাদা বল্লেন, M A D বুঝতে পারলেন না, না কি? আপনার তবে রাঁচি যাওয়ার দেরি আছে। আরো কিছুদিন এম-বি-গিরি চালান।

তারপর বল্লেন,—শেষে একটা ফিমেল ট্রেনে উঠে পড়েছেন হে ব্রাদার, পৌঁছুতে পারবেন তো ?

আমি বল্লাম—ফিমেল ট্রেন ! সে কি, এই তো সবাই পুরুষ মানুষ রয়েছে। আপনি রয়েছেন !

দাদা বল্লেন—আরে মেল ট্রেনের ভাড়া কি আর আমাদের দেওয়ার সাধ্য আছে। আপনারা হলেন ডাক্তার, এম-বি পাশ ডাক্তার। মাদ্রাজ মেলে গেলেন না কেন ?

আমি বল্লাম—ওঃ, সেই কথা বলছেন ? এই জন্য নিজেকে ম্যাড বলছেন ? আমিও তেমনি এম-বি, মাস্টার অব বয়েজ, ছেলে ঠেঙাই, ঐক্য-বাক্য-মাণিক্য বানান মুখস্থ করাই। পুরী চলেছি, ওখানে জগড়নাথ বিদ্যা-গড়গড়িতে একটা ইনটরভিউ আছে, যদি চাকরিটা জুটে যায়।

দাদা বল্লেন, ওঃ ব্রাদার, তুমিই সেই ট্রিপল এম-এ প্লাকড় ! আমি ওখানে সেকেন মাষ্টের। চলো—ভালোই হবে।

ব্যুমেরাং

ছোটকাকিমা তার করেছেন—ছোটকাকা অসুস্থ, আমাকে দেখতে চান। সংবাদ পেয়েই তাই ছুটে এলাম।

ছোটকাকাকে আপনারা চেনেন, বাংলাদেশের ছেলে-বুড়ো সবার মুখে তাঁর নাম, তাই পরিচয়টা আর বেশি করে দেবো না। তিনি একাধারে চিত্র প্রযোজক, পরিচালক, পরিবেষক। এই ত্রিশক্তির সমবায়ে তিনি ত্রিশূলপাণির মতো পূজনীয় হয়ে উঠেছেন। যে কাগজে তাঁর ছবি ছাপা হয় না, প্রশস্তিবন্দনা করে না, তাদের দুর্দিন চলছে বুঝতে হবে। চিত্রের বিচিত্রগামী জীবনে ছোট-কাকার খ্যাতিকে ছাপিয়ে উঠেছে পসার। শহরের সাতটা সিনেমার মালিক তিনি, হালে টালিগঞ্জে স্টুডিও করেছেন। অর্থাৎ, যাকে বলে হোমরা-চোমরা ব্যক্তি, তাই।

ছোটকাকার জীবনী একসময়ে বিস্তারিতভাবে লেখা হবে, আর তার প্রয়োজনও আছে। এমন করিৎকর্মা লোক দুটি দেখিনি। এই সেদিনও তাঁর যে ছবিটা নিয়ে হৈ হৈ হয়ে গেল—যাকে বলে 'হিট পিক্চার নাম্বার ওয়ান'—তারও পুস্তিকায় দেখি কাহিনী, এমন কি গানও লিখেছেন ছোটকাকা নিজেই। সরস্বতীর কমলবন তোলপাড় করা সে কী গল্প! দেখে তো দেশবাসী থ' মেরে গেল। সবাই বল্লে—সাবাস বটে গল্প, একাধারে বায়োস্কোপ, থিয়েটার, যাত্রা, সার্কাস সব। আমি জানি ছোট-কাকা গল্প লেখেন না, লেখান। ফরমূলার ফাঁদে ফেলে হুকুমের

প্যাঁচ কসে এক একটি গল্প যা খাড়া করেন, তার মূল চেহারার সঙ্গে চুলগাছটির সাদৃশ্য থাকে না। তাই তো তাঁর সব রচনাই মৌলিক।

আমিও গল্প লিখি শুনে ছোটকাকা বলেছিলেন—ওর পরকালটা ঝরঝরে হয়ে গেল, ওকে দিয়ে পাঁচসিকের নভেল লেখা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আসলে ছোটকাকা লেখকদের কৃপা-করুণার চক্ষেই দেখতেন; নিজে পয়সাই চিনতেন—বই চিনতেন না, কিনতেন না, পড়তেন না। তিনি বসে বসে বই পড়ছেন একথা কল্পনা করাও তাঁর পক্ষে দুঃসহ ছিল। গল্প লিখতে আবার বই পড়তে হয় নাকি? তবে ফরমুলা জানা চাই, প্যাঁচ কসা চাই, করুণে-কঠিনে-মধুরে মিলিয়ে দর্শকদের দ্রব করে দেওয়া চাই। সে জাদু জানতেন তিনি, অন্তত তাই তাঁর ধারণা ছিল।

আর গান! ও তো গড়ে সাতটা গানের আটটা লাইন জুড়ে দিলেই আর একটা ফিল্মী গান হয়ে যায়, ওর জন্যে আবার কে মাথা ঘামায়। যেখানে অসুবিধা, নায়িকা গান কিছুটা গেয়ে একটু কাজ করে নিলে—দর্শকদের নজর গেল সেদিকে। ওসব ফিকির-ফন্দী তিনি সব জানেন।

এ হেন ছোটকাকা, তাঁর অসুখে কিনা আমার ডাক পড়েছে। রীতিমত দুশ্চিন্তা নিয়ে 'কাকাবাড়ি' এসে পৌছুলাম। কাকাবাড়ি তাঁর বাড়ির নাম নয়। মামাবাড়ির অনুকরণে আমরা ভাইপো-ভাইঝিরা তাঁর বাড়িকে 'কাকাবাড়ি' বলি।

কাকিমার সঙ্গে দেখা হল। জিজ্ঞাসা করলাম, কী অসুখ হয়েছে কাকাবাবুর?

কাকিমা মুখ ভার করে বল্লেন—আমি কি ছাই বুঝতে পারছি যে কি হয়েছে। তেমন মারাত্মক তো কিছু দেখি না। অথচ বলেন, কঠিন ব্যারাম হয়েছে—ব্যুমেরাং। হ্যাঁ বাবা, ব্যুমেরাং কি-ধরনের অসুখ?

ব্যুমেরাং! মাথা চুলকোতে লাগলাম। ডাক্তারিবিদ্যা জানা নেই, বিশেষ করে মেডিক্যাল নোমিনক্লেচার এমন খটমটে মনে হয় যে, আমি তো কিছুতেই মনে রাখতে পারিনে। হবে বা লাঙ্‌স্ কি টাঙ্‌স্ ঘটিত কোনো অসুখ।

কাকাবাবু কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করলে কাকিমা আঙুল দিয়ে দোতলার কোণের ঘরটি দেখিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন।

ছোটকাকাকে আমরা তাঁর ভাইপো-ভাইঝিরা কাকাবাবু বলি। তিনি বরাবরই একটু বেশি রকমের বাবু, চিত্রজগতে প্রতিষ্ঠা-লাভের পর সে শৌখিন উন্নাসিক ভাব আরো বেড়েছিল।

কিন্তু এবার ঘরে ঢুকে দেখি তাঁর মুখে তিন দিনের কাঁচা পাকা দাড়ি গজিয়েছে, চোখের কোণে দুশ্চিন্তার কালি জমেছে, কপালে পড়েছে বলি-রেখা।

তিনি পাখার নিচে শুয়ে আছেন আর ঝুঁচকি—তাঁর মেজ মেয়ে, তাঁর মাথায় আইস্‌ব্যাগ ধরে ইনিয়ে-বিনিয়ে রবীন্দ্র-সংগীত গাইছে:

"যেদিন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন......"

একেবারে বাছাই করা বিদায়-সংগীত। এও কি ছোট-কাকারই নির্বাচন? তিনি কি তবে সত্যিই আমাদের ছেড়ে যেতে চাইছেন?

আমি ঘরে ঢুকলে বুচকি গানটা একটু থামালে, তারপর টেবিলের উপর থেকে থার্মোমিটার নিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে আবার গান ধরলে :

"যেদিন জমবে ধূলা তানপুরাটার তারগুলায়,
কাঁটালতা উঠবে ঘরের দ্বারগুলায়......"

অস্বস্তিতে ছোটকাকা ছট্‌ফট্‌ করে উঠলেন. বিহ্বলভাবে তাকালেন. তারপর সহসা আমার দিকে নজর পড়তেই একেবারে উঠে বসে খপ্‌ করে আমার হাত ধরে বিছানার উপর টেনে বসালেন। 'তুই এসেছিস্‌ ? আমি ভাবলাম, তুইও বুঝি ওদের দলে ভিড়ে গেলি।' কথা ক'টি বলে তিনি হাঁপাতে লাগলেন।

কাদের দলে ?—আমি ঔৎসুক্য ভরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম।

ছোটকাকা বললেন—কেন, বুঁচকিদের। বুঁচকি, পটা, ঘটা···

তাঁর কথায় বাধা পড়ল ; ফোঁস করে উঠল বুঁচকি ; বল্লে—আবার তুমি বুঁচকি বলছ ?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ বুঁচকি বলবেন না, কি বলতে হবে ?

সে সটান উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার সুরে বলতে আরম্ভ করলে, জানি, তুমি বলবে, নামে কি এসে যায় ? কিন্তু নামের কি মাধুর্য নেই, অর্থ নেই, মোহ নেই ! ধরো রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের নাম 'সঞ্চয়িতা', 'চয়নিকা' না রেখে যদি রাখতেন 'বৃহৎ পদসংগ্রহ' তবে কেমন মানাতো ?

তা ছাড়া দিদির পটেশ্বরী নাম পছন্দ হল না, সে কেমন নিজে পছন্দ করে নাম নিয়েছে পুলকেশী। যখন ছবিতে নামবে দেশের লোক নামটাও লুফে নেবে।

বুঁচকি এই পর্যন্ত বলে একটু দম নিলে আর সেই অবসরে আমি ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম। দিদি অর্থাৎ পটার নাম ছিল পটেশ্বরী, তিনি হয়েছেন পুলকেশী। আমার এক লেখক বন্ধুর নাম পুলকেশ, সে পুলকেশী নামটা শুনে পুলকিত হবে কি না ভাবলাম এক মুহূর্ত। এলোকেশী চলত এককালে, এখন অচল। তাই বুঝি পুলকেশীর আবির্ভাব! মন্দ কি? কিন্তু বুঁচকি কি বৃহন্নলা হলে খুশি হবেন, না বিদিশা?

জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার কী নাম স্থির হয়েছে?

একটু লজ্জার রেশ মিশিয়ে সে জবাব দিলে: কানুদা নাম রেখেছে বাগেশ্রী।

কানুদার পরিচয়—তিনি বুঁচকির গানের মাস্টার, পুরো নাম কানাড়া কর।

কিন্তু বাগেশ্রী তো চমৎকার নাম। আমি বুঁচকির পক্ষ নিয়ে বল্লাম: এমন একটা চমৎকার সুরের নাম পেয়ে আপনারাই বা বুঁচকি নামের উপর এতো জোর দিচ্ছেন কেন?

কাকিমা এই সময় এসে পড়ায় আমার সমস্যা অনেক পরিষ্কার হয়ে গেল। পটা—পটেশ্বরী, ঘটা—ঘটেশ্বর এবং বুঁচকি—বিরজা-সুন্দরী—এ সব ছোটকাকা যে যুগে ছেলেমেয়েদের নাম রেখেছিলেন তখনো তিনি চিত্রজগতের আওতায় আসেন নি। ছেলেমেয়েরা যখন বড়ো হল তখন ঘরের আবহাওয়া বদলে গেছে, ফিল্ম ডাইরেক্টরের বাড়ি যাতায়াত করছে চিত্রতারকা ও হবুতারকার দল। তারা কেউ চিত্রগ্রীব সরকার, কেউ শিখিপুচ্ছ সেন, কেউ কোকিলা চাকলাদার। এদের মধ্যে খটা-পটা চলে না; ঘটেশ্বর,

পটেশ্বরী আরো বেমানান। অতএব তারা পুলকেশী হতে চাইবে এ আর এমন কি অন্যায়!

এতক্ষণে আমার নজরে পড়ল, বাগেশ্রীর পরনে একখানি বিচিত্র রেশমী শাড়ি। এমন শাড়ি কেউ আটপৌরে পরে না, বা প'রে রোগীর পরিচর্যায় আসে না। জিজ্ঞাসা করে জানলাম—বাগেশ্রীর পরনের শাড়িখানির নাম—'উদয়ের পথে' শাড়ি, গায়ে 'মানে-না-মানা' ব্লাউজ। সে বল্লে—এ দুটোই পুরোনো প্যাটার্ণ, কোনো রকমে ঘরে পরা চলে। দিদি আজকাল পরে 'চন্দ্রলেখা' চেলি, 'শাদি-কে-বাদ' শালোয়ার।

ডাক্তার যেমন করে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়, তেমনি করে কাকিমার কাছে তাঁর তিন ছেলেমেয়ের তথ্য সংগ্রহ করলাম। পটাই বড়ো, এখন বয়স বছর কুড়ি হবে। বেশির ভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকে, পুরুষ বন্ধুর সংখ্যাই বেশি। ছবিতে নামবে নামবে করে—এখনো নামেনি। তার গানের মাস্টারকে নিয়ে ভাগবার আয়োজন করেছিল, সে বেচারী শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে চিঠি লিখে সব কথা জানিয়ে কাজে ইস্তফা দিয়ে গেছে। ড্রাইভারকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি, শেষে একদিন বেচারীর বউ এসে কেঁদে পড়ে সব কথা বল্লে। তারা গরিব মানুষ, বড়োলোকের বাড়ি চাকরি করতে এসে এ কি বিষম দায়! অগত্যা ড্রাইভারটিকে বাড়ির চাকরি ছাড়িয়ে স্টুডিওতে কাজ দেওয়া হয়েছে। এক কথায় বলা চলে, ছবিতে দেখা নানা গল্পের নায়িকার ভূমিকায় নিজেকে বসিয়ে পটা একটা কিছু চমকপ্রদ ঘটনা ঘটাবার চেষ্টায় আছে। অথচ পাশে পাশে যে সব চিত্রগ্রীব শিখিপুচ্ছের দল ঘুরছে তাদেরও মনে ধরছে না।

ছোটকাকার টাকা আছে, মেয়েরও রূপ একেবারে নেই এমন নয়, তবু ছোটকাকা তাঁর বড়ো মেয়ের আজো বিয়ে দিতে পারলেন না—এই তাঁর এক নম্বর রোগ।

ঘটা অর্থাৎ ঘটেশ্বর, সে তার নাম রেখেছে দুটি। ইংরাজী ছবিতে নামবার জন্য মিঃ ঘোটক (ঘটক উপাধির নূতন উচ্চারণের স্বাভাবিক বিকার) আর হিন্দি ও বাংলা ছবির জন্য—অশ্বকুমার। অশোককুমারকে কোণঠাসা করতে সে বদ্ধপরিকর।

বয়স বছর আঠারো, বেশ বাড়ন্ত গড়ন। কোঁচা লুটিয়ে লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবী পরে মেয়েদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ানো সে কাপুরুষতার লক্ষণ মনে করে। চোয়াড়ে চেহারা, মনটা আরো চোয়াড়ে। একখানা ভারী মোটর-বাইকে দক্ষিণ কলকাতা কাঁপিয়ে বেড়ায়। ঘোড়ায় চড়ার শখ আছে, পড়ে হাত-পা ছড়েছে দু'-একবার। এখনো মোটর-বাইকে চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা ছোটায়, সাঁতরে স্টীমার ধরে। একদিন পার্ক-সার্কাসের পার্কের গাছে চড়ে মোটা কাছি ধরে ঝুল খাচ্ছিল। মনের ভাবটা, জনি ওয়েসমূলারের মতো টারজানের রোলে নামবে কোনো দিন। আরিফ লেনের শরিফ খাঁ দোস্তের পুত্র চিনতে পেরে ধরে নিয়ে এলেন। বাপের জেম্মা করে বল্লেন—'তোমার এ লেড়কা বড়ো ডানপিটে, পাকা ডাকু না হয়ে যায় না।' সেও আজ বছর চারেক হতে চলল। ডাকু না হলেও ডানপিটে ভাব সারেনি তার। ফলে চলন্ত ট্রেন থেকে নামবার কসরৎ আয়ত্ত করতে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙে হাসপাতালে পড়ে আছে। এই কাকাবাবুর দুই নম্বর রোগ।

তারপর এই বাগেশ্রী, মিস বাগেশ্রী ঘোটক। বয়স তেরো-চোদ্দো—এরই মধ্যে দিদির নকলে 'মানে-না-মানা' ব্লাউজ পরেছে,

'উদয়ের পথে' শাড়ি ওড়াচ্ছে। আর সেই যে হামেশা ছবিতে দেখা যায় পিতার মৃত্যুশয্যায় বসে নায়িকারা নাকিসুরে বেদনার গান গায়—তারই অনুকরণে এইমাত্র ছোটকাকার রোগশয্যায় সে গান ধরেছিল:

"যেদিন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন···"

রবীন্দ্রনাথ যদি জানতেন তাঁর গান নিয়ে এমন চরম পরিহাস হতে পারে তবে বোধ হয় তিনিও গান লেখা ছেড়ে দিতেন। ছোটকাকা কখনো কল্পনাও করেন নি, যখন কারো জ্বর-যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে পড়তে থাকে তখন তার কাছে বিদায়-রাগিণী কেমন জমজমাট লাগে। যার বাপ কিম্বা মা মারা যায় তাকে দিয়ে তখুনি একখানি করুণ গান গাওয়ানো কত বড় জুলুম। ছবির গল্পে লোকে যা কোনো রকমে সহ্য করে, ব্যাবহারিক জীবনে সেই সব জিনিসই কত অসহ্য। বুঁচকির অসময়ে গান শুনে তাঁর বিরক্তি প্রকাশেই তা ধরা পড়েছে। ছোটকাকার এও আর এক রোগ।

সব রোগের মূল ও সমাহার এক—ব্যুমেরাং। যে অস্ত্র নিক্ষেপ করে ছোটকাকা অগণিত দর্শক ও শ্রোতার হৃদয় জর্জরিত করতে চেয়েছেন, সেই অস্ত্রই ফিরে এসেছে তাঁর কাছে, এসে বসে গেছে তাঁর অঙ্গে, হৃদয়ে, মর্মমূলে। তিনি বুঝেছেন, গল্প শুধু গল্পই নয়—তারও একটা বাস্তব দিক আছে, আছে আদর্শের মূল্য।

আমাকে একাকী পেয়ে ছোটকাকা আমার হাত ধরে বল্লেন: তুই এর একটা বিহিত কর বাবা। এতোকাল আমি লেখকদের ঠকিয়ে নিজের যা-তা কাহিনী দিয়ে ছবি তুলেছি, তার ফল

নিজেই ভুগছি। তুই তো খাসা গল্প লিখিস্—একটা নতুন ধরনের গল্প খাড়া কর দেখি, যাতে এই অপোগণ্ড তিনটের চোখ ফোটে। যত টাকা লাগুক আমি তার ছবি তুলব।

আমি বল্লামঃ কিন্তু আপনার যে অসুখ!

ছোটকাকা হেসে বল্লেন—তাই সারাবার জন্যই তো এই দাওয়াই।

আমার দক্ষিণ হস্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কখনও কখনও আমি চিন্তা করিতে থাকি, অঙ্গুলির অস্থিব্যবস্থার মধ্যে যেন অসাধারণ কিছু দেখিতে পাই। কি দেখিতে পাই সে কথা বলিলে আপনারা বিশ্বাস করিতে পারিবেন কি না জানি না, তবুও না শুনাইয়াও পারিতেছি না। অতএব শ্রবণ করুন।

আমি দেখিতে পাই, আমার করপুটে পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাস করিতেছেন। চমকিয়া উঠিবেন না, গাঁজাখুরি নহে, সত্য কথা। করপুটটি আমার, তাই আমি জানিতে পারি, কিন্তু যেহেতু এটি তাঁহাদের অজ্ঞাতবাস তাই আপনারা দেখিতে পান না। তবে আপনাদের বোধোদয়ের জন্য আমি সরলার্থ বর্ণনা করিতেছি।

আমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে যুধিষ্ঠির স্থির হইয়া বসিয়া আছেন এবং তর্জনীতে অর্জুন, মধ্যমায় ভীম, অনামিকায় নকুল এবং কনিষ্ঠায় সহদেব অধিষ্ঠান করিতেছেন। যখনই আমি মনে মনে কোন বিষয়ের খসড়া প্রস্তুত করিতে থাকি অমনি তাঁহারা চঞ্চল হইয়া উঠেন এবং আমি যাহা লিখিতে চাহি ঠিক তাহার বিপরীত কথা লিখিয়া দেন। আমাকে তথা লেখকগোষ্ঠীকে আপনারা পাঠকেরা যে মনে মনে অবিশ্বাস করেন তাহার কারণ এইখানে। নতুবা শহরের একটি জীর্ণ কুটিরের প্রায়ান্ধকার শীতল আবছায়ায় যখন কোন কাহিনী রচনা করিতে বসি তাহাতে সেই নির্বাত সঙ্কীর্ণ অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, আলোলেশহীন, প্রাণরসহীন দুর্দশার করুণ নির্মম সত্যটাই প্রকটিত হইয়া উঠিতে চাহে। কিন্তু যুধিষ্ঠির

বিচক্ষণ, তখনই পরামর্শ দিতে থাকেন, "ও গল্প বিকাইবে না; বালীগঞ্জের গল্প লেখো, লেকের তটে উপবিষ্ট তরুণ-তরুণীর মনের কথাটি বর্ণনা করো, তাও যদি না পারো অগত্যা ছায়াঘন পল্লীপথ, আলোকোজ্জ্বল দীঘির পাড় প্রভৃতি মিষ্ট মধুর ভাষায় গ্রামের বর্ণনা করো, তবে যদি পাঠক পড়েন এবং প্রকাশক দু'পয়সা পারিশ্রমিক দেন। অর্জুন তর্জন করিয়া উঠেন এবং বৃকোদর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া লেখনী মুদ্গর ধারণ করেন এবং নকুল ও সহদেব ভ্রাতৃদ্বয়ের ইঙ্গিতে কাগজের উপর চাপিয়া বসেন। অগত্যা যাহা লেখা বাহির হয়, তাহার নমুনা দিবার প্রয়োজন নাই।

আজিকার লেখাটিও আমার দক্ষিণ হস্তের ষড়যন্ত্রে সাধিত, তবে অন্যান্য রচনার সহিত ইহার একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। আমি একজন অসাধারণ কবির জীবনীকোষের একাংশ জানিতাম, জানিলেও সেই সত্য প্রকাশে সাহসী হই নাই, মনে মনে বৃত্তান্ত আলোচনা করাও গর্হিত জ্ঞানে সেই সত্য গুপ্ত রাখিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির সম্মত হইলেন না। আমি সত্য গোপন করিতেছি দেখিয়া রুষ্ট হইয়া ভ্রাতা অর্জুনকে আদেশ করিলেন, ফলে একটি পাইলট * এক কর্ম করিয়া বসিল।

মুখবন্ধ অধিক বিস্তৃত না করিয়া মূল উপাদানে যাওয়া যাক্।

আমি মামাবাড়ি থাকিয়া বি-এ পড়িতাম। আমার মামা ব্যবসায়ী, পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে আমি তাঁহার ব্যবসায়ের অনেক কাজ করিয়া দিতাম। একদিন মামা ডাকিয়া বলিলেন, আজ রবিবার, ওপারে একটু বেড়াতে যাবি?

* 'PILOT' fountain pen

আমি সম্মত হইলে মামা বলিলেন, ওপারে স্বরূপ চাটার্জি মশাইয়ের কাছে আমার কিছু টাকা পাওনা আছে। যাকে তাকে তাঁর কাছে পাঠাতে পারি নে, তাতে ক্ষুণ্ণ হন। তাঁর ছেলে তোর সঙ্গে পড়ে, সেই উপলক্ষ্য করে গিয়ে ভদ্রভাবে টাকাটার তাগিদটা জানিয়ে আসবি, পারবি তো?

রাজি হইয়া সাইকেলে বাহির হইয়া পড়িলাম। ওপারে স্বরূপ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি পৌঁছিতে আধঘণ্টা লাগিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন বাড়ী ছিলেন না। আমি আমার সহপাঠী অরূপকে ডাকাডাকি করিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ির অদূরেই একটি চৌমাথায় যেখানে দু'তিনটি দোকান বসিয়া ছোট্ট একটু বাজারের মত গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই দিক্ হইতে স্বয়ং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। তাঁহাকে আমি দু'একবার দেখিয়াছি, তাই তাঁর প্রবল কণ্ঠস্বর চিনিতে ভুল হইল না।

সাইকেলখানি বহির্বাটীর বারান্দায় ঠেসান দিয়া আমি সেই চৌমাথার দিকে অগ্রসর হইলাম। যাইয়া দেখি পথের উপর একটি জেলের ডালা নামান হইয়াছে এবং তাহা ঘিরিয়া কয়েকজন উৎসাহী খরিদ্দার মৎস্য ক্রয় করিতেছে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের অপেক্ষা গোলযোগ কম হইতেছিল না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একহাতে ধরিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে অপরহস্তে একটি কচুর পাতায় মৎস্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। 'আর দু'টি' 'আর দু'টি' করিয়া চাহিয়া তাহার ভাগের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ করিয়া লইয়াও তিনি পরিশেষে তৃপ্ত হইলেন মনে হইল না। তারপর জেলে যখন মৎস্যের মূল্য প্রার্থনা করিল তখন হাঁকিয়া উঠিলেন,—

আমি কি তোর জন্য দাম গাঁটে করে বসে রয়েছি। নিয়ে যাস কাল পরশু। জেলে আপত্তি তুলিয়া বলিল,—তিন দিনের দাম আজিও পায় নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চলিতে চলিতে বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, সবই একসঙ্গে নিবি।

আমি তাঁহার সম্মুখে পড়িলাম, নমস্কার করিলাম, তবু তাঁহার গতি প্রশমিত হইল না। অগত্যা আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। তিনি একেবারে নিজের বাড়ীর সীমানার মধ্যে পৌঁছিয়া তবে পশ্চাতে দৃষ্টি দিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কি নাম তোমার ?

আমি নিজের পরিচয় দিয়া আমি যে তাঁহার পুত্র অরূপের সহপাঠী সে কথা তাঁহাকে জানাইলাম। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, অ, তুমিও ফেল মেরেছ বুঝি, তাই খাতির পাতাতে এসেছ অরূপের সঙ্গে ?

অরূপের মত আমিও আই. এ. ফেল করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখ হইল, তবু বলিলাম, না, আমি আপনার কাছেই এসেছি, মামা পাঠালেন।

মামা! তিনি কে? আমি ত চিনি নে!

চেনেন বৈ কি। তারাপ্রসন্ন রায়কে চেনেন না? তিনি পাঠিয়েছেন, আপনার কাছে কিছু টাকা পাওনা আছে তারই জন্যে।

ওঃ, তাই বলো। বোসো বোসো, বৈঠকখানায় উঠে বোসো। সে কথা বলতে হয়—বোসো, আমি আস্‌ছি।

আশান্বিত হইলাম, মনে হইল হাতে হাতে টাকাটা মিটাইয়া দিবেন। বৈঠকখানা বলিয়া নির্ণীত ঘরে উঠিয়া কোথায় বসিব ভাবিতে লাগিলাম। একখানি চালাঘর, উপরে যথেষ্ট ঝুল জমিয়া আছে। পশ্চাদ্‌ভাগে একখানি মাত্র বেড়া আছে; সম্মুখে, দক্ষিণে,

বামে কোন দিন বেড়া উঠিয়াছিল তেমন চিহ্ন নাই। এমন অবারিত না হইলে কি বৈঠকখানা! ভিতরে একটি জারুলকাঠের আলমারি ঘরের উত্তর অংশে থাকিয়া বাড়ির দিকটায় কিছু পরিমাণে আড়াল সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার সম্মুখে একখানি কাঠের তক্তপোষ, তাহার উপর একটি শতচ্ছিন্ন সতরঞ্চি এবং একটি তাকিয়া। তাকিয়াটি দীর্ঘকাল ব্যবহারে হুঁকার খোলের মতো কালো হইয়া উঠিয়াছে। সতরঞ্চির উপর আধ-ইঞ্চি পুরু ময়লা। রুমাল দিয়া একটুখানি পরিষ্কার করিয়া বসিতে গেলে কঁ্যাচ্ কোঁচ্ শব্দ করিয়া সমস্ত তক্তপোষখানি এমন আপত্তি জানাইয়া দুলিয়া উঠিল যে, বসিতে সাহস হইল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া মেঝের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, কতকাল হইতে নারিকেলের ছিবড়ের গুঁড়া জমা হইয়া আছে। একটি খুঁটির গায়ে দুই তিনটি হুঁকা, একটির গায়ে কড়ি বাঁধা। খুঁটির পাশে মেঝেতে কয়েকটি তালের খুঁটি পড়িয়া আছে। ঘরের খুঁটির গায়ে তেলের চিহ্নে মনে হইল ঐ তালের খুঁটিগুলির উপরও প্রত্যহ কেহ না কেহ বসিয়া তামাক খায়। মেঝেতে সারাঘরে তামাকের গুল গড়াগড়ি যাইতেছে!

বসিবার কিছু না পাইয়া অগত্যা দাঁড়াইয়া রহিলাম। এই ঘরের দক্ষিণ দিকে পথ এবং পথ হইতে অদূরেই নদী। নদী আর পথের মাঝে একটি বৃদ্ধ কাঁঠাল গাছ অষ্টাবক্র মূর্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। নদীর ঘাটে কাহারা স্নান করিতেছে।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই সকল দেখিতেছিলাম। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই যে বসিতে বলিয়া বাড়ির ভিতর গিয়াছেন আর ফিরিবার নামটি নাই। সেই সংখ্যার কলেজ ম্যাগাজিনে আমার

একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। বাহিরের নদী, পথ ও কাঁঠাল গাছের দৃশ্য, স্নানরত বালকবালিকার আনন্দোচ্ছ্বাস আমার কবি-মনের উপর হয় তো একটি স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলাইতেছিল, কিন্তু ঘরে যে দিনের বেলাতেও মশক সাদর সংবর্ধনা জানাইতে ভুলিতেছে না ইহাই আমাকে ক্ষণে ক্ষণে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল। অবশেষে যখন পা ভারী বোধ হইতে লাগিল তখন বিরক্তচিত্তে উঠানে নামিলাম। সৌভাগ্যবশত খড়মের ধ্বনিও বহির্বাটীর দিকে আসিতেছে শুনিয়া আমার নির্বাপিত আশা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। আমি ভালোছেলের মতো চট্ করিয়া বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলাম।

বকিতে বকিতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাহিরে আসিলেন। এত রাগ যে তাঁহার কাহার উপর হইয়াছে জানিতে পারিলাম না। শুধু সেই ব্যক্তি যে তাঁহাকে পথে বসাইবার চেষ্টায় আছে এ-কথার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই রাগত অবস্থাতেই তিনি তক্তপোষের উপর বসিলেন, মচ্ মচ্ শব্দ করিয়া দুলিয়া উঠিয়াও মালিককে অনুভব করিয়া অশান্ত অশ্বের মতো তক্তপোষ তাঁহার ভার স্বীকার করিয়া লইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বসিয়াই বলিলেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন, বোসো।

ভয়ে ভয়ে বসিলাম, তারপর আরও ভয়ে ভয়ে বলিলাম,—বেলা বাড়িতেছে। আমার গৃহে ফিরিবার তাড়া আছে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—বোসো না বাপু। তোমরা হ'লে শিক্ষিত ছেলে, দেশের ইন্‌টেলিজেন্‌শিয়া, তোমাদের সঙ্গে আলাপ করেও আনন্দ পাই।

তাঁহার মুখে ইংরেজী শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম। তবু ভয়ে ভয়ে বলিলাম,—আর একদিন এসে বরং আলাপ করা যাবে। আজ আমার একটু তাড়াতাড়ি ফেরবার দরকার আছে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চটিলেন, অর্থাৎ এবার আমার উপরেই চটিলেন, বলিলেন, তবে যাও না, বসে আছ কেন?

আমি বললাম, টাকার জন্যে এসেছিলাম, বস্‌তে বললেন, তাই—

তাই আমিও তো সেই টাকার জন্যেই বস্‌তে বল্‌ছি।

বসিয়াই ছিলাম, এবার নড়িয়া চড়িয়া ভালো করিয়া বসিলাম। তখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিলেন, একটা খবর বুঝি পাও নি তোমরা? তা' কি করেই বা পাবে বলো। আমি তো তোমাদের রবীন্দ্রনাথের মতো ঢাক পেটাতে চাই নে। তবু যখন জানবে তোমরা সবাই যে ছুটে আসবে তা' তো বুঝতেই পারছি। সেই জন্যে এই বৈঠকখানা, বার-বাড়ি সবই আস্তে আস্তে করিয়ে তুলছি। কিন্তু পুত্রটি কুলাঙ্গার। ফেল করবার খবর পেয়েই মাকে নিয়ে মামাবাড়ি উঠে বসেছে। একা একা ক'দিকে সামলাই বলো তো। তোমায় বসিয়ে রেখে মাছ কুটে সাঁৎলে রেখে তবে এলাম। গিয়ে হয় তো দেখবো বেড়ালে মাছ খেয়ে গেছে। ক'দিক সামলাই বলো তো। দেশ বিদেশের কত লোক আসবে। তাদের আদর-অভ্যর্থনা দেখাশোনা করা,—না পারি এ-দিক দেখতে, না পারি ও-দিক —বলিতে বলিতে তিনি সহসা হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া উঠানে নামিয়া গেলেন। তাঁহার একপাটি খড়ম বারান্দায় পড়িয়া গেল এবং ব্যস্ততায় তিনি মুক্তকচ্ছ হইয়া গেলেন। তাকাইয়া দেখিলাম

একটি বাছুর উঠানে বাঁধা ছিল, উঠানের অপ্রচুর দূর্বাঘাসের মধ্যে আপন আহার্য খুঁজিতে খুঁজিতে সহসা সে কোনো নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি জিহ্বা বাড়াইয়া দিয়াছিল,—চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাইয়া পড়িতে পড়িতে একটি ফুলগাছের কয়েকটি পাতা বাছুরটির মুখের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছিল। বকিতে বকিতে তিনি বাছুরটিকে সরাইয়া অন্যত্র বাঁধিয়া রাখিয়া আসিলেন।

আমি গোপন খবরটির প্রতি সামান্য ঔৎসুক্য বোধ করিতেছিলাম কিন্তু আমার টাকার তাগিদটি ভুলি নাই। তাই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ফিরিয়া আসিলে বলিলাম,—আমাকে আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবেন, আজ যা দেবেন—

আমার বাক্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি বলিলেন,—খবরটি কিন্তু এখন গোপন রেখো। তোমরা শিক্ষিত ছেলে, তোমরা এর কদর বুঝবে তাই কথাটা বলছি।

আমি বলিলাম, ব্যাপার কি বলুন তো?

নোবেল প্রাইজ!

নোবেল প্রাইজ? তার মানে?

তার মানে এবারে নোবেল প্রাইজের সাহিত্যবিষয়ক পুরস্কারটি পাবে এশিয়ার, ভারতবর্ষের, এই বাংলা দেশের, আমাদের এই মূলঘরের—স্বরূপ চট্টোপাধ্যায়। সব ঠিক হয়ে গেছে, শুধু একদিন স্টেট্‌স্‌ম্যানে সংবাদটি বেরুতে যা বিলম্ব। তাও সংবাদ নিয়ে জানলাম—রয়টার সংবাদটা দেব দেব করছে, শুধু যুদ্ধের সংবাদের হিড়িকে দিতে পারছে না। দিয়ে ফেল্‌লেই স্টেট্‌স্‌ম্যান ছেপে দেবে। এখন ভক্তেরা ধরেছে আমার একটা

ফোটো স্টেট্‌স্‌ম্যানে আগে থাকতে পাঠিয়ে দিতে। আচ্ছা, কি বেশের ফোটো দেওয়া যায় বলো তো?

আমি ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স সহ বি-এ পড়িতেছিলাম; বাংলা সাহিত্যেরও একটু আধটু পড়াশুনা করিয়া থাকি। কিন্তু কোথাও স্বরূপ চট্টোপাধ্যায় নামে কোনো লেখকের কোনো রচনার সহিত আমার পরিচয় ঘটে নাই। তাই আন্তরিক কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—

আপনার রচনা নোবেল প্রাইজ পাচ্ছে? চমৎকার! কিন্তু আপনি কি লেখেন, কোথাও দেখি নি তো!

বাইরের কাগজে আমি লিখি নে। আমার বই পড়ে জার্মাণ পণ্ডিতেরা কি বলেছে সে শুনো একদিন ললিতের কাছে! ললিত, ঐ আমাদের ললিত মিত্তির, প্রফেসর। ওর বড় শ্যালক নিজে শুনে এসেছে ও-দেশে কি হুলুস্থুল পড়ে গেছে আমার কবিতায়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনার বই আছে?

হুঁ।

কতগুলি?

একখানা,—নোবেল প্রাইজ একখানা বইকেই দেওয়া হয়।

বইখানার নাম কি?

রাস।

আপনি বাংলায় লেখেন, না সোজাসুজি ইংরেজীতে?

বাংলায় আবার কবিতা হয় নাকি? কবিতা লিখতেন কালিদাস আর জয়দেব সংস্কৃতে, বিদ্যাপতি মৈথিলীতে, আর এ যুগে আমি লিখেছি ইংরেজীতে। বাংলায় কবিতা লেখার চেষ্টা বৃথা, অপোগণ্ডেরাই সে চেষ্টা করছে।”

রবীন্দ্রনাথ হইতে আধুনিকতম কবি বিড়ালাক্ষ পর্যন্ত সকলের কবিতা আমার মুখস্থ, তবু বলিতে চাহিলাম না। শুধু বলিলাম, ইংরেজীতে আপনি কি বিষয়ে কবিতা লিখেছেন?

কবি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, দেখ হে বাপু, আমার জন্ম চট্টোপাধ্যায় বংশে। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র সকলেই আদতে কবি ছিলেন, কেবল ভালো ইংরেজী জানতেন না বলেই কবিতা না লিখে গল্প লিখে গেছেন। আমি ইংরেজী ট্রানশ্লেশন শেখবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজীতে কবিতা মেলাতে আরম্ভ করি। আমার কবিপ্রতিভার উন্মেষের প্রথম ঘটনা বড়ই রোমান্টিক।

চাপিয়া ধরিলাম, কি ব্যাপার বলুন তো?

তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, আমাদের সময় বলত সিক্সথ্ ক্লাস। ক্লাসে দাঁড়িয়ে বাংলা শুনে মুখে মুখে ইংরেজী তর্জমা করে শোনাতে হ'ত। একদিন মাস্টার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, ইংরেজী বলো, "একটি কুকুর একটি মোরগকে ডাকিয়া বলিল।

আমি উত্তর দিলাম—

"Barking a dog
Said to the cock".

শুনে মাস্টার মশাই অবধি আমার কবি-প্রতিভা স্বীকার করলেন। তার পরেও পাঁচ ছয় বছর আমি ইস্কুলে পড়েছি কিন্তু প্রবেশিকার পথে কাব্যসরস্বতী বাদ সাধলেন। সকল যুগের বড় কবিরাই ইস্কুল-পালানো ছেলে।

ভুল বশত রবীন্দ্রনাথের নামটা উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়া বলিলাম, রবীন্দ্রনাথও ইস্কুল-পালানো ছেলে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ক্ষুব্ধ হইলেন, বলিলেন, কিন্তু তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ভদ্রতা জানতেন না।

আমি এরূপ দোষারোপে মনে মনে উষ্ণ হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি ভদ্রব্যবহার করতেন বলেই তো শুনি।

তিনি বলিলেন, তবে আমার পত্রের উত্তর দিলেন না কেন বলতে পারো? চিঠিতে লিখেছিলাম, মশাই, নোবেল প্রাইজ তো আপনিও পেয়েছেন, আমিও এবার পাবো। এখন সত্যি করে বলুন দিকি, কাজটা হাঁসিল করতে কাকে কি পরিমাণ নজর দিতে হবে! সত্যি বলতে কি, জমিজমা আমারও কিছু আছে, দরকার হলে দু' একখানা বন্ধক রেখেও না হয় প্রয়োজনীয় টাকাটা জোগাড় করা যাবে, আবার পুরস্কারের টাকাটা পেলে জমিজমা খালাস করলেই হল। তা ভদ্রলোক চিঠিখানার উত্তর পর্যন্ত দিলেন না।

হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম, শুধু বলিলাম, পত্র হয়তো তাঁর হাতে পৌছায় নি।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অন্য প্রসঙ্গে কথা ঘুরাইয়া নিলেন, বলিলেন, আমার এই বইখানার প্রেরণা জুগিয়েছে ঐ কাঁঠাল গাছটি।

নদী ও পথের মধ্যবর্ত্তী সেই অষ্টাবক্র বৃদ্ধ কাঁঠাল গাছটির দিকে তাকাইলাম। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিতে লাগিলেন, উহার শাখায় দু'টি হলদে পাখী, যাকে তোমরা বলো "বউ কথা কও" পাখী, এসে দুলে দুলে গান করত। তার থেকে রাধা-কৃষ্ণের তুলনা মনে এনে রাসলীলা স্মরণ করে আমার বই লিখেছি—রাস।

আমার বলিতে হইল না, তিনি নিজেই পা গুটাইয়া বসিয়া একখানি মলিন ঝাড়নে বাঁধা এক বাণ্ডিল কাগজ খুলিতে লাগিলেন। উহা যে তিনি বাড়ির ভিতর হইতে আসিবার সময় লইয়া আসিয়াছেন তাহা এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই। খুলিতে খুলিতে আবার তাঁহার বিস্মৃত ক্রোধ জাগ্রত হইল এবং অনুপস্থিত পুত্র যে তাঁহার মুদ্রিত পুঁথিখানি কোথায় ফেলিয়া গিয়াছে তাহা না পাইবার জন্য রাগারাগি করিতে লাগিলেন।

মোড়কটি খুলিয়া এক বাণ্ডিল কাগজ বাহির হইল; আমাদের স্থানীয় মুদ্রণশালায় নিকৃষ্ট ধরনে ছাপা কাগজ। বলিলেন, বহি আকারে বাঁধাইয়া নোবেল প্রাইজ কমিটিতে পাঠানো হইবার পর বাকি ছাপা ফর্মা বাড়িতে ছিল, অরূপ কোনো সময়ে পুরাতন কাগজ-পত্রের সহিত বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। একখানি মাত্র বাঁধানো বই ছিল, তাহাও যে কোথায় রহিয়াছে পাওয়া যাইতেছে না। এই 'ফাইল কপি'টি 'ওরিজিনাল ম্যানাস্ক্রিপ্টে'র সহিত লোহার সিন্দুকে তোলা ছিল। প্রাইজটি পাইবার পর এ সবই অবশ্য তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে দান করিবেন।

আমার হাতে সেই অমূল্য ফাইল কপিটি তুলিয়া দিয়া তিনি আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। আমার বাল্যের কথা মনে পড়িল, অল্প বয়সে আমার স্কন্ধে একবার দুষ্ট সরস্বতী ভর করিয়াছিলেন এবং আমিও ইংরেজী কবিতা মিলাইতে সুরু করিয়াছিলাম। একদা লিখিলাম—

I saw a cat

To catch a rat.

এই অপূর্ব কবিতা লিখিয়া আমাদের ক্লাসের কবিধুরন্ধর গোবিন্দ

সেনকে দেখাইলাম। সে সংশোধন করিয়া লিখিয়া দিল—

I saw a cat
To kiss a rat.

এবং বুঝাইয়া দিল, পরের ঘটনা যতই হিংস্র ও বাস্তব হউক মার্জারের মুষিকপ্রীতি কবির ভাষায় মনোরম করিয়া না শুনাইলে কাব্য রসহীন হইবে। এই পর্যন্ত শিখিয়া ইংরেজী কবিতা লিখিবার প্রয়াস ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাহার কারণ একজন শিক্ষকের বিষয়ে কাব্য রচনায় যত রসসৃষ্টি করিয়াছিলাম তাহা শিক্ষকের কর্ণগোচর হওয়ায় ফলটা মনোরম হয় নাই। তদবধি পাঠ্য কবিতা ব্যতীত ইংরেজীতে কবিতা পরিহার করিয়াই চলিতাম। আজ গোটা একখানি ইংরেজী কাব্য এবং স্বয়ং কবির সম্মুখীন হইয়া পড়ায় নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ হইতে লাগিল।

কবি বলিলেন, দেখ, পড়ে দেখ। তোমরা শিক্ষিত ছেলে, দেশের ভবিষ্যৎ, তোমাদের না দেখিয়ে কাকে দেখাব ?

আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষের উপর দিয়া সারি বাঁধিয়া কালো কালো অক্ষর পিপীলিকার সারির মত চলমান হইয়া উঠিল। কি পড়িলাম তাহার এক বর্ণও আমার মগজে প্রবেশ করিল না, কিন্তু আমার নিবিষ্ট ভাবে কবি নিরতিশয় প্রীত হইতেছেন এমন আশ্বাস পাইতে লাগিলাম।

আমি কেবল দুই তিনটি পাতা উল্টাইয়াছি এমন সময় কবি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, কে, ভুবন নাকি ? এসো, তামাক খেয়ে যাও।

ভুবন নামক কোনো গ্রামবাসী পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহার বেশভূষা কথাবার্তায় বুঝিলাম সে গৃহস্থদের নারিকেল সুপারি

পাড়িয়া দেয়। সে আসিয়া তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল, অনেক বেলা হল কর্তা, তামাক খাবার সময় নেই।

কর্তা অর্থাৎ কবি বলিয়া উঠিলেন, চুপ চুপ, ব্যাটা মুক্ষু, দেখছিস নে, বাবু গ্রন্থ পড়ছেন। তোরা তো পড়ে শোনালেও বুঝতে পারিস্ নে। আমি সেই যাতে লাখ টাকার উপর পুরস্কার পাব সেই বই পড়তে এই বাবু শহর থেকে সাইকেলে চড়ে এসেছেন। এখন এমন রোজই আসবে, দেশ-বিদেশের কত গুণী মানী। তোকে বল্লাম বাইরের ঘরতুয়ারগুলি একটু বেড়া ঘিরে দে, শুনলি নে তো! দেখ্ এই বাবু এসে ময়লা খাটের উপর বসে কষ্ট পাচ্ছেন, আর ফুলের চারা গোরুবাছুরেই মাড়িয়ে মুড়িয়ে দিলে।

ভুবন নামক ব্যক্তিটি নারিকেলের ছিবড়ে আঁশ করিয়া গুলি পাকাইতেছিল। এবার তক্তপোষের তলা হইতে একটি আগুনের মালসা টানিয়া তুষের আগুনের মধ্যে সেটি গুঁজিয়া দিয়া বলিল, আমি না হয় গা-গতরে খেটে দেব, কিন্তু আর কিষাণ কেউ বাকিতে কাজ করতে চায় না। সবাই অভাবের মানুষ, কবিতার কথায় তাদের পেট ভরে না।

কবি চটিয়া কর্তা মূর্তি ধারণ করিলেন, বলিলেন, বাকি মানে? এই নোবেল প্রাইজটা পেতে যা দেরি, তারপর এসব ঘর ভেঙেচুরে তো রায়েদের চেয়ে বড়ো করে ইমারত তুলব। এ ক'টা দিনের দেরিও কি তোদের সইবে না? হ্যাঁ, কলি, কলি, এঁকেই বলে ঘোর কলি। দেখবি এই বড়ো কর্তার কাছে দুদিন পরে এসে হাত পাততে হবে সারা দেশের লোকের। লাখ টাকা কার আছে শুনি, নোবেল প্রাইজ কেউ কোনো জন্মে

পেয়েছে এদেশে, কে থাকে এই ঝোপ ঝাড় জঙ্গল আর মশা ম্যালেরিয়ায় ? এক আমিই যা আছি তোদের ছেড়ে থাকতে মন সরে না তাই যাই না, নতুবা কবে ক'লকাতায় গিয়ে বাড়িঘর করে একটা মানুষের মতো মানুষ হয়ে বসতাম।

ভুবন আসায় আমি বাঁচিয়া গিয়াছিলাম, কবির মনোযোগ আমার উপর হইতে ভুবনের উপর যাইয়া পড়িয়াছিল। ইতিমধ্যে আমি হু হু করিয়া সমস্ত পাতাগুলি উল্টাইয়া যাইয়া শেষের পাতাটির উপর স্থির হইয়া ছিলাম যাহাতে কবির মনোযোগ আমার প্রতি আকৃষ্ট হইলেই গ্রন্থ অধ্যয়ন শেষ করিবার দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাই।

হুঁকায় কয়েকটি সুখটান দিয়া কবি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমার অটল নিষ্ঠায় তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, এর মধ্যে পড়ে ফেলেছ ? শিক্ষিত ছেলে তোমরা, তোমরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ। তারপর, কেমন লাগলো বলো ?

উচ্চ প্রশংসার যতগুলি কথা জানা ছিল সবগুলি একত্র করিতে যাইয়া থতমত খাইয়া গেলাম, শেষে বলিলাম, জীবনে এমন কবিতা আর পড়ি নাই, কোথায় লাগে শেলি, কীট্‌স্‌, ওয়াডস´ওয়ার্থ! কথাটা সর্বৈব সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্তত ছাপার অক্ষরে ইত্যাকার রচনা কোনো দেশে কোনো কালে কেহ প্রকাশ করিয়াছে কিনা তাহা বিশেষ গবেষণার বিষয়। এত মূল্যবান বস্তু নোবেল প্রাইজ কমিটির হস্তে পৌঁছিবার পূর্বে খোয়া না যাইয়া থাকে।

কিন্তু কবি এইটুকুতেই নিরস্ত হইলেন না। জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—কোন্ কবিতাটি সর্বাপেক্ষা সুন্দর লাগিল।

এবার আমি বিলক্ষণ ঘামিয়া উঠিলাম। মোট কতগুলি কবিতা আছে তাহা পর্যন্ত লক্ষ্য করি নাই। আন্দাজে বলিয়া ফেলিলাম —সতেরো নম্বরেরটা।

হুঁকা সহিত হাতখানা তিনি আমার দিকে সবেগে বাড়াইয়া দিলেন, বলিলেন, ব্রাভো! পুরস্কার পাওয়ার পর তোমাকে আমি একখানা বই মরক্কো চামড়ায় বাঁধিয়ে উপহার দেব। সতেরো নম্বরের কবিতাটায় আমি রাধাকৃষ্ণের প্রেম যে কত তীব্র তাই বর্ণনা করেছি। জগতের মনীষীরা স্বীকার করেছেন, এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা।

জগতের মনীষীরা কি স্বীকার করিয়াছেন তাহা জানিবার সহিত জানিতে পারিলাম কলিকার আগুনের কিয়দংশ আমার নূতন পাঞ্জাবীর বর্ধিত ঝুল সংশোধিত করিতেছে। তাড়াতাড়ি আগুন নিবাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, বেলা অনেক হইল, আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কবি বলিলেন—অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, যুগান্তর, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, হিন্দু—মাদ্রাজ, সার্চলাইট—পাটনা, হিন্দুস্থান টাইম্‌স্‌—দিল্লী, বম্বে ক্রনিক্‌ল্‌ প্রভৃতি পত্রিকায় কি সমালোচনা করেছে শুনবে? সব তারিখ আর মতামত আমার মুখস্থ আছে বলিয়া সেই ইংরেজী বাংলা ক্ষীণ প্রশংসার বাক্যগুলি আওড়াইতে সুরু করিলেন।

একজন গ্রামবাসী ভদ্রলোকের বাড়িতে টাকার তাগাদায় আসিয়া দিনে দুপুরে এতবড় বিপদে পড়িতে হইবে আমি কখনো এমন আশঙ্কা করি নাই। অধীর চিত্তে বলিয়া ফেলিলাম—অনেক বেলা হল, আজ উঠি।

কবি থামিলেন. বলিলেন—সত্যি অনেক বেলা হ'ল। কিন্তু তুমি ভাবতে পারো, আমি একজন নোবেল লরিয়েট, এ রিয়েল পোয়েটিক জিনিয়াস, মানে খাঁটি কবি-প্রতিভা, কুলীন ব্রাহ্মণ এই দ্বিপ্রহর বেলাতে এখন গিয়ে ভাত রেঁধে তবে আমায় খেতে হবে। স্ত্রীপুত্র আমার সঙ্গে অসহযোগ করেছেন।

মনে মনে ভাবিলাম, আহা—অরূপ ও তাহার মাতা এই বাড়ি হইতে বাহির হইতে পারিয়া কি আরামের নিঃশ্বাসই না ফেলিয়াছেন! এবার লক্ষ্য করিলাম, আমাদের অলক্ষ্যে ভুবন কোন্ ফাঁকে উঠিয়া পালাইয়াছে।

সহসা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার হাত ধরিয়া অনুনয়ের সুরে বলিলেন, তোমরা শিক্ষিত ছেলে, দেশের ভবিষ্যৎ, তোমরা ইচ্ছা করলে আমার একটু উপকার করতে পারো।

কৌতূহল চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কি উপকার?

খুলনায় তো তোমার অনেক জানাশুনো আছে, একটি ভালো মেয়ে দেখে দিতে পারো? একটু বয়স্কা হলেও ক্ষতি হবে না, ব্রাহ্মণ হ'লেই হ'ল।

আমি কথাটির ধাঁচেই অর্থটা আঁচ করিলাম, তবু একটু ঘুরাইয়া বলিলাম, অরূপ বি-এ-টা আগে পাস করুক, তারপর বিয়ে দেবেন, সেই ভালো হবে না কি?

এবার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অধীর হইবার পালা। তিনি বলিলেন,—আহা, অরূপের কথা বলছি না, আমার নিজের জন্যই বলছি। নিজ হাতে আর রেঁধে খেতে পারছিনে।

বলিলাম—একজন ঠাকুর রাখুন না কেন?

রেখে দেখেছি বাপু, এ যাবৎ আট ন'জন পালালো। যাওয়ার সময় দু' একখানা তৈজসপত্রও সঙ্গে নিয়ে যায়। তাই আবার বিয়ে করব ভাবছি। এমন কি বয়স হয়েছে আমার? মাত্র দুটো দাঁত সান্নিকের অসুখে পড়ে গেছে। আর সান্নিকের জন্যই চুল পেকেছে। তারপর স্বর নিচু করিয়া বলিলেন, চুল না পাকলে নোবেল প্রাইজটাও কি পাওয়া যেত? ওটাও যে একটা দরকারী জিনিস। তবে বলো তো কলপ লাগাতে পারা যাবে এই প্রাইজটা পাওয়ার পরে। তোমরা শিক্ষিত ছেলে, অনেক শিক্ষিত শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে তো পরিচয় আছে, দাও না একটা জুটিয়ে—যার কবির প্রতি শ্রদ্ধা আছে, নোবেল লরিয়েট স্বামী কার ভাগ্যেই বা জোটে?

চেষ্টা করিব ভরসা দিতে হইল। এত কথার পরও কিন্তু আমি কাজের কথা পাড়িতে ছাড়ি নাই, বলিলাম—টাকা ক'টা দিন, আমি উঠি।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—টাকা? তার ভাবনা কি? প্রাইজের টাকাটা পেলেই মিটিয়ে দেব। তুমিই এসে নিয়ে যেও। তুমি শিক্ষিত ছেলে, তোমার সঙ্গে আলাপে বড় পরিতুষ্ট হলাম। কিন্তু ঐ যে কথাটি বললাম, একটু মনে রেখো—একটি ভালো পাত্রী জোগাড় করে দাও, আমি তোমাকেও সন্তুষ্ট করে দেব।

সেদিন ফিরিয়া আসিলাম। তারপর অনেক দিন গিয়াছে, আমি কলেজের সব ক'টা পরীক্ষা পাস করিয়া ব্যবসায়ে নামিয়া কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে আর যাওয়া হয় নাই। বিশ্বস্ত সূত্রে জানি, মামার খাতায় তাঁহার নামে হিসাবের জের চলিতেছে, আর কোনো খবর পাই নাই।

যোগ্যং যোগ্যেন

আমাদের দেশে প্রথা আছে, ক'নে দেখিবার সময় বৃদ্ধ লোককে সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। বৃদ্ধদের দৃষ্টি-শক্তি বেশি, তা নয়। বয়সের সঙ্গে সে-শক্তি বরং কমিয়া আসে। আসল কথা, বৃদ্ধদের চোখে নেশা লাগে না, তাঁরা থাকেন দর্পণের মতো! দর্পণে ছায়া পড়ে, ছবি আঁকে না। সুতরাং সুনীলের বিয়ের ক'নে দেখিতে একজন বৃদ্ধ খুঁজিতে হইল! আমি সুনীলের বড়ো ভাই। ক'নে-পছন্দর ব্যাপারে আমারও সেদিক্ দিয়া কিঞ্চিৎ অধিকার থাকিবার কথা।

পাড়ার পাকড়াশি-মশাইকে পাকড়ানো গেল। বৃদ্ধ বলিয়া বটে, তা ছাড়া বৃদ্ধের রস-জ্ঞান এবং রুচিবোধ দুই-ই বেশ প্রখর। কিন্তু আমার সহিত বিয়ের ক'নে দেখিতে যাইবার প্রস্তাবে পাকড়াশি রাজি হইলেন না, বলিলেন,—ঐ বস্তুটি ভায়া সযত্নে পরিহার করে চলেছি। ন্যাড়া ক'বার বেল-তলায় যায়?

বেল-তলার কথায় একটা বিগত কাহিনীর আভাস পাওয়া গেল। কথাটা চাপা দিয়া পাকড়াশি বলিলেন,—বিয়ের ক'নে দেখবার উদ্দেশ্যই হ'ল 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ!' অর্থাৎ কি না—

অর্থ দুরূহ নয়! বলিলাম,—আপনার কাহিনীটা শোনা যাক!

পাকড়াশি গলা সাফ করিয়া কহিলেন, কাহিনী কি একটা হে ভায়া, বিস্তর! সংক্ষেপে বল্‌ছি। কিন্তু সর্বশেষ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, প্রজাপতির নির্বন্ধই হচ্ছে যোগ্যং যোগ্যেন! না

হয়ে উপায় নেই। ধরো, এই আমার ব্যাপার! কোন্ ত্রেতা-যুগে বিয়ে হয়েছিল, সে-বয়সের গাছ-পাথর নেই। কিন্তু প্রজাপতির নির্বন্ধ সে সময়েও নির্ভুল ছিল। তাই দেখো না, আজ আমার অম্বল, তো ব্রাহ্মণীর চোঁয়া-ঢেকুর! আমার পা ব্যথা, তাঁর মাজা কন্‌কনানি,—এ হতেই হবে। সাধে বলি যোগ্যং—

বাধা দিলাম। বলিলাম,—আপনার ক'নে-দেখার কাহিনী শোনান। পাত্রীটি কি নিজের জন্য? না, অপরের জন্য দেখতে গিয়েছিলেন?

—রামঃ, নিজের জন্য ক'নে কেউ নিজে দেখতে যায়? ও সব বাপু তোমাদের আজকালকার ফ্যাশান হয়েচে। আমাদের কালে ছিল না। অভিভাবকেরা ক'নে পছন্দ করতেন আর আমরা বন্ধু-বান্ধবের মুখে চুট্‌কি-চাট্‌কি শুনে মনে-মনে ধ্যান করতাম নোলক-পরা একখানি লজ্জানত মুখ! তার ঘোমটায় ঢাকা মুখ—ভাবতেই কেমন কাব্য জাগতো। তার পর শুভদৃষ্টির সময় যাঁকে দেখা যেতো, তিনি হুবহু সেই স্বপ্নে-দেখা রাজকন্যা। তাঁর নাকের নোলক আর সীঁথির সিঁদুর—

আবার বাধা দিতে হইল। বলিলাম—কিন্তু আবার আপনার নিজের কথা এসে যাচ্ছে। আপনার ক'নে দেখার কাহিনী শুনতে চাই।

বল্‌ছি।—পাকড়াশি মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন:

আমাদের পাড়ায় এক ডাক্তার ছিল। তার নাম এখন আর বলতে চাইনে। আমি নাম দিয়েছিলাম অশ্বিনীকুমার। তাঁর চিকিৎসানৈপুণ্যে ডক্টর অব ডিভিনিটি উপাধি। ছোকরা খাস্ কলকাতার পাশ এইচ্-এম্-বি। এইচ্‌টা প্যাডে, নোটিশবোর্ডে

—সর্বত্রই ছোট হরফে লেখা। মফস্বল হলে কি হবে, ভুলেও সে স্যুট না পরে রোগী দেখতে বেরুতো না। এক বার টাইয়ের গিঁট ফস্‌কে গিয়েছিল বলে রোগীর বগলে থার্মোমিটার এঁটে রেখে বাড়ি চলে এসেছিল টাই টাইট্‌ করতে,—এমন স্মার্ট, এমন বিচক্ষণ চিকিৎসক।

সুতরাং অশ্বিনীকুমার যাকে বিয়ে করবে, সে মেয়ে যে শুধ্‌ সুন্দরী হবে না, তার সঙ্গে নীরোগ, সুস্থ, সবল হবে,—এ তো জানা কথা। অশ্বিনীর আর কোনো অভিভাবক ছিল না, অগত্যা আমাকেই তার সঙ্গে ক'নে দেখতে যেতে হলো।

মেয়ে দেখতে যাবার সময় অশ্বিনী পথে আমায় তালিম দিয়ে নিলে,—বিয়ে করা মানে কি জানো খুড়ো, একটা ফরেন্‌ বডি ইন্‌জেক্ট করে ফ্যামিলি-শরীরে ঢোকানো! ফল একটা কিছু হয়ই। ভালো-মন্দ কলহ মনান্তর নানা উপসর্গ ঘটতে থাকে। ঘটতে ঘটতে ইনার সেল্‌ বডিতে যখন ইয়ে হয়, মানে, দু'চারটি কুপুষ্যি হাত-পা মেলে দেখা দেয়, তখন সব আবার ধীরে ধীরে ধাতস্থ হয়ে আসে! তদ্দিন পর্যন্ত সহ্য করতে হবে! সুতরাং সেই ফরেন্‌ ব'ডিটি সিলেক্ট করতে একটু—

ব্রাহ্মণীর কথা তুলতে চাইছিলাম, বাধা দিয়ে অশ্বিনী বললে, —আরে রাখো, তাঁরা সব সতী-লক্ষ্মী! ও-রকম মেয়ে কি আর আজকাল পাবে?

বলতে বলতে নেবুতলায় এসে পড়লাম এবং অচিরে এক ভদ্র-ভবনের বৈঠকখানায় সাদর-অভ্যর্থনা-সহ আমাদের উপবেশন।

মেয়েটির নাম শুনলাম অণিমা। চেহারা চেয়ে চেয়ে দেখবার মতো। আমি তখন বিয়ে করেছি, সত্য বলতে কি, অল্প বয়সে

ব্রাহ্মণীরও কিছু সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল। হলে হবে কি, আমার ভিতরের শাশ্বত পুরুষটি বার-বার আড়-চোখে মেয়েটিকে দেখে নিচ্ছিল। পরিহিত বসনে অজস্র প্রফুল্ল কমল শোভা পাচ্ছে, চরণে অলক্ত-রাগ। সে রাঙা চরণ লাভ করলে বুঝি কাঙালেরও স্বর্গ-লাভ হয়। এমন ইণ্ডিয়ান-আর্ট-মার্কা কিশোরীর ভালে যে ভাগ্যবান্ সিঁদূর ছোঁয়াবে, সে নিশ্চয় কোনো দুর্গম গহনে সাধনা করছে!

পাকড়াশি মশাইয়ের উচ্ছ্বাসে চমকিত হইলাম। ভদ্রলোকের নিশ্চয় কবিতা লেখার ব্যারাম ছিল বা আছে! নচেৎ পরস্ত্রীর ব্যাপারে এত উচ্ছ্বাস কেন? অথবা, পরস্ত্রীর রূপ-ব্যাখ্যানই হইল রীতি! যাহা হউক, শুনিতে লাগিলাম; পাকড়াশি মশাই বলিয়া চলিলেন—

অশ্বিনীর ভাগ্যে আমার হিংসা হতে লাগলো, তবু সঙ্গীর কানে কানে বল্‌লাম—মূঢ়, মতি স্থির হলো?

অশ্বিনীর যেন সত্যিই নেশা লেগেছে! কিসের নেশা—বোঝবার আগেই সে একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে বললে—অ্যা নি-মি-আ!

অভিভাবক নিকটেই ছিলেন। বললেন,—না না, অণিমা! অণিমারাণী রায়।

পরিচারিকা অণিমারাণীকে অন্তরালে নিয়ে গেল।

অশ্বিনী এবার গম্ভীর ভাবে অভিভাবকের দিকে তাকিয়ে বললে,—কিন্তু কেস্ যে অ্যা-নি-মি-আ! পারনিশাস অ্যা-নি-মি-আ! কি চিকিৎসা করাচ্ছেন? কবরেজি? না এলোপ্যাথি? হেমোগ্লো-বিন প্রিপারেশান খাইয়েছেন কখনো? ও কাজটি করবেন না!

ভেরি ব্যাড আফটার-এফেক্‌ট্‌! এই তো তিনকড়ি চক্কোত্তির মেজো শ্যালীর ছোট মেয়ে, বুঝেচেন কিনা—

—তারও অ্যানিমিআ? তা কিসে সারলো বলুন তো? অণিমার চেহারা তো দেখলেন। চেহারায় কিছু মালুম হয় না! মাস ছয় আগে একবার ভুগেছিল ডিসেন্‌ট্রিতে।

—ঠিক ধরেছি, পারনিশাস্‌ অ্যানিমিয়া। গায়ে এক-বিন্দু রক্ত নেই, চোখের কোণে কালি। কত বয়স হলো? জিভ সাফ আছে কি না জিজ্ঞেস করুন তো।

অভিভাবক বাড়ির মধ্য থেকে শুনে এসে বললেন,—জিভ সাফ আছে। গায়ের রং দেখেই তো বুঝেচেন, ওর সবই সাফ। পায়ের নখ থেকে চোখের তারা পর্যন্ত।

—তারা পর্যন্ত! আমি জিজ্ঞেস করলাম,—চোখের তারা সাদা নাকি আপনার মেয়ের?

—আজ্ঞে, আমার মেয়ে নয়। আমার মাস্‌-শাশুড়ীর মেয়ে, মানে, ইয়ে আর কি। তা চোখের তারা সাদা হবে কেন। ঐ কথার কথা বল্‌লাম আর কি। এমন সাফ-সাফাই স্বভাব আর পাবেন না।

অশ্বিনী একখানা কাগজ চেয়ে নিয়ে কলম কামড়ে' মাথা চুল্‌কে' অনেকক্ষণ ভেবে প্রেস্‌ক্রুপশান লিখলে। আমি ভাবছিলাম মেয়েটির চোখের কথা। আহা, একেবারে যাকে বলে 'কালো হরিণ চোখ', চোখের কোলে স্বভাব-কজ্জল রেখা। সকালবেলার সোনালী আলো নদীর তরঙ্গে যেমন কাজলের রেখা আঁকতে থাকে, ঠিক তেমনি! আর পাষণ্ড অশ্বিনী বলে কিনা,

অ্যানিমিআ! রক্তশূন্য হলে বুঝি চোখ অমন হয়? অ্যানিমিআ, না, তার মাথা!

আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো। দেখি, অণিমার ভগ্নীপতি মহাশয় অশ্বিনীর হাত থেকে প্রেসকৃপ্‌সান নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, অশ্বিনীও উঠেছে! অগত্যা আমিও উঠলাম। আর এক বার অণিমাকে দেখবার সুযোগ হলো না।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—শীগগির সেরে যাবে আশা করেন, কেমন?

অশ্বিনী গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—কেস্‌টা পারনিসাস্‌, তাই একটু সময় নেবে।

ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন,—তারপর, মেয়ে কেমন দেখলেন? আপনাদের মতামত কি?

উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, অশ্বিনীই উত্তর দিলে—কেস্‌টা পারনিশাস্‌ কিনা—একটু টাইম নেবে।

প্রথম বারে বলেছে 'সময়'। এবার বললে 'টাইম'। পার্থক্যটা অভিভাবক হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলেন—আমরা পথে বেরুলাম।

এমন সাংঘাতিক ঘটনার পর দ্বিতীয় বার আর অশ্বিনীর সঙ্গে মেয়ে দেখবার উদ্দেশ্যে যাবো না, স্থির করলাম। কি কাজ এই সব যা নয় তাই ঘাঁটাঘাঁটি করে। আছি বাপু নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, আপিস, আড্ডা আর অর্ধাঙ্গিনীকে নিয়ে। কিন্তু অশ্বিনী গোল বাধালে আবার। সোজা পথে হলো না দেখে ধরে বসলো ব্রাহ্মণীকে, এবং তাঁর রেকমেণ্ডেশন এড়াতে না পেরে আবার যেতে হলো অশ্বিনীর সঙ্গে। তবে এবার আর ইণ্ডিয়ান

আর্ট নয়, একেবারে স্মার্ট আর স্মাইলিং। অশ্বিনীর মুখে কথা শুনে মনটা ব্যাজার হয়ে গেল। স্মার্ট মেয়ের সামনে শার্ট পরে যাওয়া বিধি। আমার সনাতন দোলাই-খানা মনকে পীড়া দিতে লাগলো।

পথে অশ্বিনীর সঙ্গে কথাবার্তায় মনটা ধাতস্থ হলো। সত্যি আমি তো আর বিয়ে করতে যাচ্ছিনে, আমায় নাই বা পছন্দ করলে। আর আমরা যাচ্ছি পরীক্ষক, তবে আর অত জুজু-বুড়ীর ভয়ই বা কেন। অশ্বিনীর আর্গুমেন্টটা ফ্যালনা নয়। মন্ত্রই পড়ো, আর নারায়ণ-অগ্নিকেই সাক্ষী করো,—বিয়ে যে একটা আসন্ন শারীরিক সম্বন্ধের ব্যাপার, যত গন্ধই শোনাক্—সকল লোকই এ কথা স্বীকার করবেন। অথচ বিয়ের ব্যাপারে আমরা মেয়ের রূপ দেখি, হয়তো কিছু গুণও দেখি, সব চেয়ে বেশি করে দেখি পণ আর বর-সজ্জাদির বহর। আজকাল আবার বংশ-মর্যাদার প্রশ্ন গৌণ হয়েছে। বিধবা বা অসমশ্রেণীর হলেও দোষ নেই। কিন্তু যাকে নিয়ে সারা জীবন গোঁয়াতে হবে, তার শারীরিক সামর্থ্যের বিষয়ে—তার স্বাস্থ্যের বিষয়ে খোঁজ নেবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করিনে। বিয়ের জল গায়ে পড়ে শরীর সারবার ভরসায় কত রুগ্ণ দুর্বল অযোগ্য কন্যার বিবাহ হচ্ছে। ফলে যত গহনাই মিলুক, ঘরের যতখানিই বরসজ্জায় ভরে উঠুক, বিবাহিত জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। অণিমার মায়া ফিকে হয়ে এসেছিল, বুঝলাম, অশ্বিনী ঠিক বলেছে —যাকে বিয়ে করবে, তাকে একটু বাজিয়ে নেবে না?

আমরা গন্তব্য গৃহে পৌছুলাম। মূল্যবান্ আসবাব-পত্রে গৃহস্বামীর ধনবত্তার ও আধুনিক মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া

যায়। পাত্রীর ভ্রাতাই আমাদের 'আস্তাজ্ঞা হোক' 'বোস্তে আজ্ঞা হোক্' করে আহ্বান করে বসিয়ে ভিতরে গেলেন। তাঁর আপ্যায়নের ভাষায় আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে অশ্বিনীর কানে কানে প্রশ্ন করলাম—এ যে একেবারে আলালী ভাষা হে?

অশ্বিনী বললে,—অতি পুরাতন প্রথা প্রচলনই আজকাল চরম বিলাস।

ভাই-বোন বাইরে এলেন এবং ভদ্রলোক তাঁর ভগিনী শ্রীকৌশিকী দেবী আই-কম্-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কৌশিকী কুমারী, তবে কিঞ্চিৎ কমনীয়তাশূন্য। সেটা কমার্স পড়বার দরুন কি না, বোঝা গেল না। কৌশিকীকে আমি ভুল করে জিজ্ঞেস্ করে ফেলেছিলাম—কত দূর পড়াশুনো করেছেন বললেন? বিরক্ত গম্ভীরস্বরে উত্তর এলো,—আই-কম্।

অশ্বিনী মৃদুস্বরে বললে,—আয় কম হবে কেন? আয়ু কম।—কথাটা বোধ হয় তাঁরা শুনতে পেলেন না।

সত্যি বলতে কি, কৌশিকীর বয়স হয়েছে। পঁচিশের কম মনে হলো না। গায়ে বহু-বিখ্যাত কাননবালা ব্লাউজ। তবে ঘাড়ের কাছটা একটু লীলা দেশায়ী আর হাতার কাছটা একটু সাধনা বসুর ঢং মিশিয়ে ব্লাউজটিকে অতি-আধুনিক করা হয়েছে মনে হলো। ওরিজিনাল কাননবালা-ব্লাউজ ব্রাহ্মণীরও একটা দেখেছি কিনা।

কৌশিকীর ভ্রাতা বল্লেন—কৌশিকী এবার টপ্পা আর জারি গানে অল-বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আর ওর কানাই ধামালী গান শুনে তো য়ুনিভার্সিটীতে হুলস্থুল বেধে গেছে। সেই জন্যেই ওকে কমার্স ছাড়িয়ে আর্ট পড়াবার কথা উঠেছে। তবে আপনারা

যদি খেয়াল পছন্দ করেন, তাতেও ও হার মানবে না! খেয়ালেই লখ্‌নৌ থেকে মেডেল পেয়েছে কিনা।

একটা খেয়াল গেয়ে আমাদের শ্রবণ শীতল করবার অনুরোধ পাওয়া মাত্র কৌশিকী অর্ধোল্লম্ফনে অর্গান অধিকার করলেন এবং তারস্বরে সংগীত সুরু হলো—

'আ—'—রে মেরি ননদিয়া

বিবাহের পূর্বে ননদিয়ার উদ্দেশে তিনি কী কথা বলতে পারেন মনে মনে তাই কল্পনা করছিলাম, এমন সময় অশ্বিনী বাধা দিয়ে বললে,—দেখুন. সংসার করতে সংগীত না হলেও এক-রকম চলে যায়। কিন্তু স্বাস্থ্য না হলে—

কৌশিকী নিজেই বললে,—কেন, আমার স্বাস্থ্য খারাপ?

—না, তা বলছিনে। তবে কোনো অসুখ-বিসুখ আছে কি না—

—অসুখ? ফুঃ! কৌশিকীর মুখ-বিকৃতিতে আমারও মুখ যেন বিকৃত হয়ে গেল। তার দাদা বল্লেন,—লেকে রোয়িং-এ কৌশিকী এবার উইন করেছে, জানেন না? দেখেননি ছবি কাগজে? তা ছাড়া লং জাম্প. হাই জাম্প, হকি, ক্রিকেট, বাস্কেট-বল—যাতে দেবেন, তাতেই ফার্স্ট। ও যদি মেয়ে না হতো, তাহলে মোহনবাগান কি আজ এরিআন্‌সের কাছে হারতো? হাফ্‌-ব্যাকে ও চমৎকার খেলে।

অশ্বিনী বললে—কিন্তু এ সব ওভার-একসার্‌সাইজে হার্টের ব্যারাম হয়। আপনার ব্লাডপ্রেশার কত?

কৌশিকী কুটিল নয়নে তাকালো—এক বার আমাদের দিকে, তার পর তার দাদার দিকে। অশ্বিনী অত লক্ষ্য করেনি, যেই

বলেছে,—তাছাড়া ফুটবল হকি প্রভৃতি খেলায় মেয়েদের মাতৃত্বের সম্ভাবনাও নষ্ট হতে পারে—

আর বলতে হলো না। ভাই-বোন যুগপৎ গর্জন করে উঠলো—শাট্ আপ্?

কৌশিকীর হাতের কঠিন আঙুলগুলি যেন নিশ্পিশ্ করতে লাগলো, আর তার দাদা অর্ধচন্দ্র দেখিয়ে বল্লেন—গেট আউট ইউ স্কাউনড্রেলস্!

আমি তখনও ননদিয়ার উদ্দেশে নিবেদিত রাগিণীটুকু মনে মনে গুঞ্জন করছিলাম, এখন চমকে' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আসবার সময় চা খেয়ে আসা হয়নি। ব্রাহ্মণী বলেছিলেন, মেয়ে-বাড়ি অন্তত এক-কাপ চা অবশ্য দেবে। কেবল তারই মৌতাত মনে-মনে জমিয়ে তুলছিলাম, এমন সময়—শাট্ আপ। তার পরেই গেট্ আউট এবং স্কাউন্ড্রেলস্। নেহাৎ গুরু-বল ছিল, তাই অর্ধচন্দ্র গলদেশ স্পর্শ করবার পূর্বেই পথে পা বাড়ালাম।

পথে অশ্বিনীর সঙ্গে আর স্পিক্-টি-নট্, সোজা ঘরে ফিরে এলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—অশ্বিনীকুমার চিরকুমার রইলেন?

হাসিয়া পাকড়াশি মশাই বলিলেন,—রামঃ! বাংলা দেশে আবার মেয়ের অভাব! অণিমার না হয় অ্যানিমিআ হয়েছিল, কৌশিকীর স্বাস্থ্যচর্চার কথাও না হয় বাদ দিলাম, তাই বলে অশ্বিনীর যোগ্য পাত্রী কি আর জুটবে না? গোড়ায় বলেছি তো, যোগ্যং যোগ্যেন—

বলিলাম—সে কাহিনী শোনবার জন্য অধীর আগ্রহ হচ্ছে।

পাকড়াশি মশাই বলিলেন—এবার কিন্তু আর কারো রেক-মেণ্ডেশনেই শর্মা পা বাড়ায়নি। শেষে কি স্ত্রীলোকের হাতে নির্যাতিত হয়ে পৈতৃক প্রাণটাকে খোয়াবো? অশ্বিনী একা গিয়েছিল। মেয়ের নাম মন্দোদরী। অর্থাৎ মন্দ মন্দ মানে কিনা ঈষৎ উদুরী বা অনুরূপ-রোগগ্রস্তা। অশ্বিনী সব জিজ্ঞাসা-বাদ করে রোগ স্থির করলে ওবেসিটি অর্থাৎ মেদবাহুল্য। সেই কথা বলেই উঠতে যাচ্ছিল, মন্দোদরী বল্‌লে, এবার আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে—সেটাও অবশ্য আপনার শরীর ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। তার পর অকুণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—মহাশয়ের হজমশক্তি কিরূপ? রাত্রে ভাত রোচে—না, লুচি? কম করে খেলে হজম হয়? মাসে ক'বার সর্দি লাগে? অম্বলের উদ্গার ওঠে কি না? চোখের লং শর্ট উভয় দৃষ্টিই অক্ষুণ্ণ আছে কি না?—এটা সেটা নানা কথা বল্‌তে বল্‌তে শেষ পর্যন্ত মেয়েটি বল্‌লে—আপনার জিভ বের করুন তো।

অশ্বিনী জিভ বের করবে কি না ভাবছে, এর মধ্যে ভিতর থেকে মেয়েটির অভিভাবক খাবার নিয়ে প্রবেশ করলেন। মেয়েটিও উঠে চলে গেল। এমন অপমানিত অশ্বিনী জীবনে কখনও হয়নি। সে একটা রীতিমত পাশ-করা ডাক্তার, আর তাকেই কিনা জিভ বের করতে বলা! এ অপমানের সমুচিত শাস্তি দিতে সে বদ্ধ-পরিকর হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকা কথা দিয়ে এলো।

পাকড়াশি মশাই হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন,—আপাত-দৃষ্টিতে এদের একটু বিসদৃশ দেখায়, যেন পাহাড়ের পাশে দেবদারু গাছ! কিন্তু ইনার সোল্‌টি ঠিক আছে, অর্থাৎ যোগ্যং যোগ্যেন হয়েছে।

পাকড়াশি মশাই আমার সঙ্গী হইলেন না, কিন্তু তাঁর অমূল্য উপদেশ আমার যথেষ্ট সাহায্য করিল। শুনিয়া সুখী হইবেন, পছন্দ করিয়া যাঁহাকে আনিয়াছি, সুনীলের তিনি যোগ্য হইয়াছেন! স্বাস্থ্যের বিচারেও কেহ তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারিবে না!

পূজার বিজ্ঞাপন

নরেনের দাদার বিয়ে হ'ল শালকেয়। যেতেই হ'ল—কিন্তু লগ্ন রাত দেড়টায়। থাকি আমহার্স্ট স্ট্রীটে, সেখান থেকে শালকে নিকটে নয়, যাতায়াতও দুষ্কর। বীরেনের গাড়িতে বরের পিছু পিছু আমরাও অগত্যা রওনা হলাম।

বিয়েবাড়িটি প্রকাণ্ড—নরেনের দাদার শ্বশুর একজন রায় সাহেব,—সম্পন্ন গৃহস্থ, অধিকন্তু রুচি-সম্পন্ন। বিয়ের লগ্ন পিছিয়ে আছে—তাই আমরা বরযাত্রীর দল আগে আগে খেয়ে নিলাম। রাত তখন দশটা হবে।

কিন্তু এই সময় চেপে জল এলো—বীরেন ছুটলো তার গাড়ির হুড টেনে দিতে, আমি সিগারেটটা জ্বেলে ঘন হয়ে বসলাম। জন পঞ্চাশেক বরযাত্রী—খেয়ে-দেয়ে সবাই পান চিবুচ্ছে। শ্রাবণ মাসের বর্ষা—আরম্ভ যখন হয়েছে তখন কিছুক্ষণ হবে বলে কারো আর ব্যস্ততা নেই। খাওয়াটাও হয়েছে ভালো, কন্যাপক্ষের আদর-আপ্যায়নেরও কোনো ত্রুটি নেই। একদল বসল তাস নিয়ে, বীরেনকে ধরলে গান গাইতে—সে আপত্তি তুললে, বাসরের গানই আজ বিখ্যাত, আসরে গান তাই আজ অচল। অনিলদের বিস্তৃত ব্যবসায় সুন্দরবনের দিকে, সেদিকে তার যাতায়াত আছে। তার কাছে তাই নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়—আমি অনিলকে বল্লাম, কোনো অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী বল।

অনিল বল্লে, অ্যাডভেঞ্চার নয়—এমনি এক ঘন বর্ষার রাত্রে এক চাষী পরিবারের আমি অতিথি হ'তে বাধ্য হয়েছিলাম। তাদের বাড়িটা সুন্দরবনের অতি নিকটে। তারা সেদিন আমায় প্রাণে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু সেকথা আজ থাক. আর একদিন হবে।

হতাশ হয়ে সিগারেটটায় আর এক টান দিলাম। শচীনদা অর্থাৎ নরেনের দাদা—যিনি বিয়ে করতে এসেছেন—তিনি জিজ্ঞেস করলেন—রাত ক'টা হবে?

পিছন দিক থেকে একজন তার উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আমাদের অপরিচিত এক ভদ্রলোক বল্লেন, সুন্দরবনের কথাই যখন উঠল—তখন একটা সত্য ঘটনা শুনুন—আমি কি ভাবে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলাম।

সুন্দরবন অঞ্চলে আমাদের কিছু জমিজমা আছে—কয়েক ঘর প্রজা আছে। ও অঞ্চলে মাঝে মাঝে আমায় যাতায়াত করতে হয়। গদাই মণ্ডল আমাদের ভিটেবাড়ির প্রজা না হলেও জমিজমা করে, তাছাড়া ভদ্রলোক গেলে বেশ যত্ন-আত্তি করে। তার দুখানা ডিঙি, তিনগাছা জাল, একটা গাদার বন্দুক। সম্পন্ন গৃহস্থ।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে তাদের গ্রামে গিয়ে দেখি গদাইয়ের মেয়ের বিয়ে। আমাকে দেখে গদাই তো মহা সন্তুষ্ট। আমাকে সেদিন ফিরে আসতেই হবে—গদাই কিছুতে ছাড়বে না—বলে, তপিস্যে করে বেরাহ্মণের দর্শন পাইনে—আর এমন শুভদিনে যখন নিজে দয়া করে এসেছেন তখন কি আর—

থাকতে হ'ল, শুধু থাকতে নয় কাজকর্মের জোগাড়-যন্ত্রের খোঁজখবরও নিতে হ'ল। গদাই তো বল্লে, অন্তত সাত আট-

খানা নৌকোয় বর-বরযাত্রীরা আসবে। তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও যথেষ্ট করেছে। মাছের তো অভাব নেই। তা ছাড়া ডাল, নালের ঘণ্ট, মোচার চচ্চড়ি, চালতার টক সব ব্যবস্থা হয়েছে। এক ছেলেকে খুলনায় পাঠিয়ে টক করবার জন্যে কিছু চালতা আর সের পাঁচেক রসগোল্লা এনেছে। দই দুধ তো বাড়িতে প্রচুর। তিনটে পাঁঠা পড়েছে। আয়োজন কম কি?

ঘুরে ঘুরে তদারক করে বেড়াচ্ছিলাম। এদের সরল আয়োজনের মধ্যে যেন সহজে প্রাণ খুলে যায়। গদাই কিন্তু বিকেলের দিকে এসে বল্লে, দা'ঠাউর—আমাগো একটা পেরথা আছে। বিয়ের আগে মায়ের বাড়ি পূজো দিয়ে আসতি হয়। আপনি থাকতি আর সদ্‌ব্রাহ্মণ কোথায় পাই। যদি দয়া করেন তবে আমরা সব সঙ্গে যাই। আপনি শুধু মায়ের ঘরে পূজোটা দিয়ে ফিরে আসবেন। আর কিছু করতি হবে না। রাত এক পহরের মধ্যেই বিয়ের লগ্ন।

আজ আমাকে বিশেষ করে ধরে রাখবার একটা অর্থ যেন বুঝলাম। তবু গদাইয়ের কথাটা ঠেলতে পারলাম না—রাজি হলাম।

খাল ধরে বনের মধ্যে কিছুদূর গিয়ে ডিঙি থেকে নামতে হল। অতি অস্পষ্ট পায়েচলা পথ, কাঁটা-ঝোপ আর গাছ-আগাছার জঙ্গল। সন্ধ্যা ঘুরে গেছে। লণ্ঠনের অল্প আলোয় আমার আগে আগে পথ দেখিয়ে একজন চলেছে, পিছনে দুজন লোক, তাদের মাথায় পূজোর বেসাতি। বরপক্ষ তখনও এসে পৌছয় নি বলে গদাই তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে বাড়িতে থেকে গেল। তার এক ছেলে আর দুটি ভাগনেকে আমার সঙ্গে দিলে।

বেশ কিছু দূর চলে এসে দেবীর মন্দির মিলল। জীর্ণ মন্দির, ইঁটের উপর শ্যাওলা জমেছে—ইটের ফাঁকে ফাঁকে শিকড় বাড়িয়ে ঝুরি নামিয়ে একটি অশ্বত্থ গাছ মন্দির ফুঁড়ে উঠেছে—তারই একটি ডাল মন্দিরের সুমুখে ঝুলে পড়েছে। মন্দিরটি প্রাচীন—প্রতাপাদিত্য কি আর কারো সময়ের সেটা ঐতিহাসিকের গবেষণাসাপেক্ষ। যে রাজার সময়েরই হোক, মন্দিরের মা কিন্তু জাগ্রত দেবী। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁর কৃপা ও করুণার উপর অগাধ বিশ্বাস রাখে। কিন্তু এমন নিভৃত বনান্তরালে কোনো পুরোহিত মায়ের নিত্যসেবার ভার গ্রহণে সম্মত হয় না। তাই নিত্যপূজার বন্দোবস্ত নেই। কবে কোন্ সন্ন্যাসী মন্দির-চত্বরে এসে ধুনি জ্বালিয়েছিলেন তার ভস্মাবশেষ ও একখানা অর্ধদগ্ধ কাঠ পড়ে আছে। বোধ হয় এত ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালার অন্তরালে বাতাসও অপ্রতিহত বেগে বয় না।

শালকের বিয়েবাড়ি ছাড়িয়ে একটি চাষীর বিয়েবাড়ি সন্থ পৌঁছুতে না পৌঁছুতে একেবারে সুন্দরবনের নিভৃত অন্তরালে এক জীর্ণ মন্দিরচত্বরে সন্ন্যাসীর ধুনি-জ্বালা ভস্মাবশেষের সামনে এসে আমরা ঘন হয়ে বসলাম। গল্প বেশ জমে উঠেছে। বক্তাও বেশ গম্ভীর ভাবে বর্ণনা করে চলেছেন।

মন্দিরের দ্বার খোলা ছিল। লণ্ঠনটা সামনে ধরে সাহসে ভর করে দরজা খুললাম। ভিতরটি পরিষ্কার—লণ্ঠনের আলোকে অন্ধকার মন্দিরের অপরিসর ক্ষেত্রটুকু আলোকিত হয়ে উঠল। দেবীবিগ্রহ নিকষ পাথরের প্রস্তুত শ্যামা মূর্তি—মুখে স্নিগ্ধ শান্তি অঙ্কিত। দেখে যেন ভয় দূর হল। মন্দির-অভ্যন্তর মৃদু সুবাসে আমোদিত। দেবীর পদতলে টাটকা জবা দেখে বুঝলাম, কেউ

সন্থই পূজো দিয়ে গেছে। মন্দিরের দেওয়ালে একখানি ছোট খড়্গ ঝুলছে। কুলুঙ্গিতে মলিন কয়েকটি বেতের ঝাঁপি—একটাতে কড়ি লাগানো। বাইরে শীতের জন্যেই একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে এসেছিলাম--ভিতরে এসে মনে হল—শীত একরকম নেই-ই।

গদাইয়ের ছেলে আর ভাগনেরা বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল এবং আমি পূজোয় বসলাম। ব্রাহ্মণের ছেলে, জানি না বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, বিশেষত গদাই তো করবেই না। কিন্তু সত্যিই মায়ের পূজোর আমি কি জানি? কিন্তু কেন জানি না, সেদিন ভারি আনন্দ হতে লাগল। ভাবলাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তো ভক্তিভরে অর্ঘ্য দিতেন, মা তো তা ফিরিয়ে দেন্ নি। এই পরিবেশের মধ্যে আমার মনেও কেমন যেন দৃঢ় ধারণা হল—ভক্তিভরে পূজোর অর্ঘ্য মায়ের চরণে অর্পণ করলে তিনি গ্রহণ করবেন, ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। আর তিনি যদি গ্রহণ করেন তবে গদাইয়ের কন্যা-জামাতার তা'তে কল্যাণ হবেই।

পূজা করলাম। কি পূজো করলাম তা জানিনে—শুধু মনে আছে মাঝে মাঝে গদাইয়ের ছেলে আর ভাগনেরা তাগাদা দিচ্ছিল, আর কত দেরি, ওদিক্ বিয়ের লগ্ন যে হয়ে গেল। আমরা না গেলে বিয়েয় বসতে পারবে না। বার বার তাগাদায় যখন পূজো শেষ করে বের হলাম, তখন রাত হয়ে গেছে। তার চেয়েও চিন্তার কথা, মন্দিরের মধ্যে বসে অনুভব করি নি যে বাইরে সোঁ সোঁ করে বাতাস বইছে। গাছপালা দুলিয়ে গাছে গাছে ঘষাঘষিতে কোঁ কোঁ করে আর্তনাদ তুলে প্রচণ্ড

বেগে বাতাস বইছে। বনের মধ্যে এই, আর খোলা খালে বা বড় গাঙে যে কি অবস্থা তা তো বুঝতেই পারলাম। ওদিকে বিয়ের লগ্ন বয়ে যায়। মন্দির থেকে লণ্ঠন দুটো নিয়ে কিছুদূর চলতে চলতে সে-দুটোই নিবে গেল। ঘন অন্ধকার—পথঘাট বিপদ্-সঙ্কুল। নদী আরো ভীষণ হয়ে উঠেছে। অথচ বিয়ের লগ্ন উতরে গেলে সর্বনাশ, জাতের দায়। অগত্যা গদাইয়ের ছেলেকে বল্লাম, তোমরা একজন গিয়ে বাড়িতে সংবাদ দিতে পার যে, পূজো হয়ে গেছে। অমনি মায়ের প্রসাদী ফুল ও চরণামৃত নিয়ে যাও। বিয়ে বন্ধ না হয়; আমরা পরে যাচ্ছি।

বোনের বিয়ে, জাতের দায়—গদাইয়ের ছেলে ছুটলো—সঙ্গে সঙ্গে গদাইয়ের এক ভাগনে পেল্লাদ, সেও ছুটলো। সেই অন্ধকার বনভূমিতে তখন আমি আর ছিনাথ—গদাইয়ের ছোট বোনের ছেলে। ছিনাথ বল্লে—ঝড় আসতি পারে দা'ঠাউর। কি করা যায়?

বল্লাম—মন্দিরে ফিরে চল্। সেখানে আশ্রয় পাব।

—তুমি তো পাবা, কিন্তু আমি? আমি তো মন্দিরের মধ্যি যেতি পারব না, জীবন গেলেও না!

এ কথাটা ভেবে দেখি নি। সুতরাং নিরাপদ আশ্রয় কোথায়? ছিনাথ দেশলাই দিয়ে লণ্ঠন জ্বালবার চেষ্টা করলে—জোর বাতাসে পেরে উঠল না। দূরে নিকটে গাছপালা ঘন আন্দোলিত হচ্ছে—ডাল মড় মড় করে ভেঙে পড়ছে, মাঝে মাঝে শেয়াল শূকর প্রভৃতি জন্তু যারা শিকারে বেরিয়েছিল, তারা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নিকট দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। দেখে

বুঝলাম, এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও কোনক্রমে নিরাপদ নয়। শেয়াল শূকর হ'তে হ'তে শেয়ালের মাতুল মহাশয়ের সঙ্গে তো দৈবাৎ দেখা হয়ে যেতে পারে!

দা'ঠাউর দাঁড়িয়ো না, বলে ছিনাথ আমায় টেনে নিয়ে ছুটলো। অন্ধকারে পথ দেখা যায় না, কাঁটার খোঁচায় কাপড় ছিঁড়ে গেল, পা রক্তাক্ত হয়ে গেল, সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। ছুটছি—মন্দিরের উদ্দেশেই ছুটছি।

দেখতে দেখতে বর্ষাও বাতাসের সঙ্গে যোগ দিলে। আশ্বিন মাসের মতো ঝড় যে প্রলয়মূর্তিতে দেখা দিলে তা ভোলবার নয়। বনভূমির অনাচ্ছাদিত উলঙ্গ মূর্তির সে ভয়াবহ রূপ বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না। ক্ষণবিদ্যুতের আলোকে শুধু দেখা যায় গাছের ডালপালা বেঁকে, ঝুঁকে, দুলে, ভেঙে—সে যেন কোন্ অবুঝ ছেলের হিজিবিজি দাগ। ছিনাথ আগে আগে চলেছে—আমি তার পিছনে। অকস্মাৎ আমাদের দুজনের মাঝখানে একটা বড়গাছের ডাল ভেঙে পড়ল, তার পাতার ঝাপটা আমার গায়ে এসে লাগলো। বাতাসের গুরু গর্জন আর প্রলয়ের তাণ্ডবের মধ্যে ছিনাথের কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। ছিনাথের কি হ'ল খোঁজ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার অবকাশ দিলে না—দেখতে দেখতে আর একটা ডাল ভেঙে পড়ল, আমার মাথায় না হাঁটুতে আঘাত লাগলো সঠিক বোঝবার আগেই আমার জ্ঞান লোপ হ'ল। শুনতে শুনতে ঝাঁ ঝাঁ রব মিলিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

যখন চেতনা ফিরে পেলাম, দেখলাম প্রকৃতি শান্ত, আর আমি বুঝি কত উচ্চে—আমার পায়ের নিচে লণ্ঠন নিয়ে জনকয়েক লোক খোঁজাখুঁজি করছে। একজন বললে, এই যে, ছিনাথ

এই—। গদাইয়ের কণ্ঠস্বর শুনলাম,-কিন্তু দা'ঠাউর কোহানে। তারে ছাখ্। তারে না পালি আর ঘরে ফেরবো না।

আমি তখন গদাইকে ডেকে বল্লাম, গদাই, আমি বেঁচে আছি, এই যে এখানে আছি। আমায় নামিয়ে নাও।

সবাই উপরের দিকে লণ্ঠন তুলে দেখতে লাগলো। আমিও আমার অবস্থা অনুভব করলাম। জানি না ঐ দুর্যোগের মধ্যে কি করে আঘাত লেগে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই, আর একটা গাছের ডালে আমার গেঞ্জি আটকে' গিয়ে সেই ডালে ঝুলে আছি। বুঝলাম, ডালের খানিকটা ভেঙে পড়েছে আর খানিকটা ইলাস্টিকের মতো সোজা দাঁড়িয়ে উঠেছে। ওঠবার সময়ে আমার গেঞ্জিটা সেই ভাঙা মুখে বেধে গিয়ে আমাকে নিরাপদ দোলনায় তুলে নিয়ে এসেছিল। না হলে, এই শ্বাপদ-সঙ্কুল বনভূমিতে ঝড়ের পরে যখন হিংস্র জন্তু চরতে বেরুত, তখন অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকলে কি দশা হত কে জানে! মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম—আর ধন্যবাদ দিলাম আমার গেঞ্জিকে। মশাই, কি চমৎকার গেঞ্জি, পুরো দু'টি মাস পরবার পরেও একটা দেড়মণি মানুষকে দীর্ঘকাল ভয়ংকর ঝড়ের মুখে সে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এমন না হলে গেঞ্জি!

এই দেখুন—বলেই ভদ্রলোক তাঁর পায়ের কাছে রাখা ছোট একটি চামড়ার ব্যাগ খুলে দু'টি গেঞ্জি বের করলেন—এই হ'ল সেই গেঞ্জি যা সেদিন আমার জীবন রক্ষা করেছিল। এটি বিখ্যাত হোসিআরি ফ্যাক্টরি কালী কোম্পানির তৈরী—কালীঘাটের আদি ও আসল গেঞ্জি। পূজোর বাজারে সবাই যখন নতুন কাপড়চোপড় কিনবেন, তখন এর একটিও কিনে

রাখবেন—যেমন চৈঁকসই তেমনি সস্তা। ধন ও প্রাণ রক্ষার একমাত্র উপায়।

অনিল ব্যবসায়ী লোক—বল্লে, মশাই—কমিশন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ; কমিশনে কাজ করতে চান—অনুগ্রহ করে আপনার ঠিকানা দিন, না হয় চলুন একদিন আমাদের ফ্যাক্টরিতে। কারবারের সমস্ত রকম সুবিধেই দেওয়া হয়। পূজোর বাজারে কমিশনের হার বৃদ্ধি হয়েছে।

বাইরে তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। রাতও তখন একটা বেজে গেছে। কন্যাপক্ষ বরকে নিতে এসেছেন। নরেন বল্লে—চল্ বিয়ে দেখবি।

সে ভদ্রলোকটিকেও আমরা যত্ন করলাম, তিনি বল্লেন রাত অনেক হয়েছে, কিছু যদি মনে না করেন তবে বরং এখন—বলেই তিনি ব্যাগসহ হাত তুলে নমস্কার করলেন। তারপর বল্লেন—বুঝছেনই তো, পূজোর বাজার, একটু বিজিই আছি। কাল আবার সক্কালেই বেরুতে হবে—নইলে আপনাদের সঙ্গে থাকতে পেলে আনন্দিত হতাম।

অ্যাটম্ বম্

অফিসে সেদিন বাবুদের মুখে আর অন্য কোনো কথা নেই, শুধু অ্যাটম্ বম্—আণবিক বোমা—হিরোসিমা সাফ হয়ে গেছে। সেল্স্-এ যান, এ্যাকাউন্টস্-এ যান, গুদামে যান—সর্বত্রই অ্যাটম্ বম্! আমাদের মধ্যে যাঁরা এক সময়ে বিজ্ঞান পড়েছেন কিন্তু এখন ডেবিট ক্রেডিটের মধ্যে ব্যালান্স টানতে টানতে সব ভুলে মেরেছেন তাঁরাও পদার্থবিদ্যার অণু-পরমাণু তত্ত্ব যে যতটুকু জানেন ফলাও করে বক্তৃতা জুড়ে দিয়েছেন। কাজে আর কারো মন নেই—ঘুরে ফিরে অ্যাটম্ বমের গল্প চলছে।

চাটুজ্জে মশাই আমাদের মধ্যে বয়সে প্রবীণ, অভিজ্ঞতায় এবং পদগৌরবেও সবার উপরে, তবু তাঁর এক দুর্বলতা—স্টাফের সঙ্গে কোনদিন মারমুখো হয়ে ব্যবহার করতে জানেন না। ফলে আমরা চ্যাংড়ার দল তাঁকে পেয়ে বসি, সুযোগ সুবিধে পেলেই চেপে ধরি—একটা পুরোনো দিনের গল্প বলতে। প্রথমত তিনি চাটুজ্জে; বঙ্কিম চাটুজ্জে, শরৎ চাটুজ্জে থেকে 'স্বয়ম্বরা'র চাটুজ্জে মশাই পর্যন্ত যখন গল্প বলতে ওস্তাদ তখন তিনি 'গল্প বলব না' বললে আমরা শুনবই বা কেন? দ্বিতীয়ত তিনি নিজেই আবার আমাদের নবীনদের মধ্যে যাদের একটু ইয়ে—মানে সাহিত্যচর্চার অভ্যাস আছে তাদের লেখা ধৈর্য ধরে মাঝে মাঝে পড়েন, ভালোমন্দ মতামত প্রকাশ করেন। বলতে বাধা নেই, তাঁর সব মত অবশ্য আমাদের মনঃপূত হয় না—সেটা বয়সের দোষ, কিন্তু আশ্চর্যের

বিষয় তিনি তাতে বিরক্ত হন না, আবার যেচে লেখার সন্ধান করেন। সেই চাটুজ্জে মশাইকে গিয়ে বললাম,—এবার আর পুরোনো দিনের গল্প নয়, অ্যাটম্ বম্, তাজা পঁয়তাল্লিশ সালের মাল। গেছে হিরোসিমা উড়ে এক বোমার ঘায়ে—জানেন কিছু খবর?

চাটুজ্জে মশাই বললেন—অ্যাটম্ বম্ যখন আমেরিকার তৈরী তখন আর নতুন কি হ'ল হে? ও অনেক আগে আমাদের অফিসেই একবার পড়েছিল। ওসব আমেরিকান ব্যাপার আমাদের জানা আছে।

খবরের কাগজের সমস্ত খবর তন্ন তন্ন করে পড়েছি, কিন্তু অ্যাটম্ বমের প্রসঙ্গে কেউ কোথাও লেখেনি যে অনেকদিন আগে কলকাতার কোনো অফিসে সে বোমা পড়েছিল। ব্যাপারটা জানবার জন্যে ঔৎসুক্য জন্মাল। বললাম—কোন্ বছরের কথা বলছেন? বোমা-বৃষ্টির ইতিহাসটাই নতুন, ভারতবর্ষে তো সবে এই যুদ্ধেই জাপানী বোমা পড়েছে। এর আগে কোনদিন আমেরিকান বোমা পড়বার কথা তো শুনি নি।

শোনবার কান থাকলেই শুনতে—গম্ভীরভাবেই চাটুজ্জে মশাই বললেন। ওই গুণটি ওঁর অসাধারণ। যে যত চটুল বাক্যই বলুক, তাঁর অটুট গাম্ভীর্য যেন কিছুতেই টলে না। নারিকেলের মতো রসের পরিচয় ওঁর ওপর দিকে বিন্দুমাত্র নেই।

বললাম—খুলেই বলুন, শুনে আমাদের চিত্ত ঠাণ্ডা হোক।

চাটুজ্জে মশাই বললেন—তখন আমার বয়স অল্প, সবে নায়াগ্রা নেভিগেশান কোম্পানির অফিসে পঁচিশ টাকায় ঢুকেছি। বছর খানেক কাটল। আমাদের বড়বাবু ছিলেন—বিরিঞ্চিলাল

বিষয়ী। বড়ই বিষয়ী লোক ছিলেন তিনি। সাতাশী টাকা বেতন পেতেন, তাই দিয়ে কি করে যে কলকাতায় বিষয়-আসয় পর্যন্ত করে গেছেন তা আজও আমার কাছে রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। তাঁর ছেলে রামকুমার বিষয়ী লোহা লক্কড়ের কারবারে লাল হয়ে গেছেন। আর এক ছেলে হলধর বিষয়ী, সে রেলী কোম্পানির মেজোবাবু; ছোকরা বেশ দু পয়সা জমিয়েছে; তবু দেখা হলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, 'কাকাবাবু' বলে ডাকে।

চাটুজ্জে মশাই-এর আর এক দুর্বলতা এই টাকা জমানোর গল্প করা। কে কোথায় টাকা জমিয়ে বড়লোক হয়েছে সেই কথা উঠে পড়লে তাঁর অন্য কোনো কথা মনে থাকে না। তাই বাধা দিতে হ'ল। বললাম—বোমাটা পড়ল কোথায়?

চাটুজ্জে মশাই বললেন—বলছি, সেই কথাই তো বলব এবার।

বিরিঞ্চিবাবুর একটা গুণ ছিল—সাহেব তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে থাকত। অন্তত আমরা তাই মনে করতাম। সাহেব বলতে অবশ্য সবই যে খাঁটি আমেরিকান—তা নয়। কলকাতার ব্রাঞ্চ অফিসে প্রথম একজন আমেরিকান ছিল কর্তা, তার পরে এলেন একজন দিশি সাহেব। দাশ সাহেব তাঁর নাম। তাঁকে বাঙালী বললে ভুল হবে, কারণ তিনি কক্ষণো কারো সঙ্গে বাঙলা বলতেন না, আর মেজাজটা তিনি সব সময়েই সপ্তমে চড়িয়ে রাখতেন, পাছে আমরা কেউ তাঁকে বাঙালী বলে ভুল করি। আমরা শুনেছিলাম তিনি আমেরিকায় জন্মেছিলেন, ঘরে আমেরিকান বউ ছেলে মেয়ে, মায় চাকর সোফার পর্যন্ত আমেরিকান। শেষ পর্যন্ত জানা গেল, ব্যাপার অতটা গুরুতর নয়। কিছুকাল আমেরিকায় ছিলেন তিনি। ও দেশের দুএকটা ডিগ্রীও পেয়েছেন, তবে মেম দিশি,

বাঙালীর মেয়ে, শাড়ি পরেন, বাঙলা কথাও বলেন। এবং সব চেয়ে আশ্চর্য এই,—দাশ সাহেব বাঙলা ভাষা ভোলেননি এবং কেউ কেউ তাঁকে বাঙলা বলতে পর্যন্ত শুনেছে।

খোদ সাহেবের অনুপস্থিতিতে দাশ সাহেব এলেন কলকাতা অফিসের বড় সাহেব হয়ে। বিরিঞ্চিবাবু তাঁকে যথাসাধ্য তোয়াজে রাখেন, কাজের খাতিরে বিরিঞ্চিবাবুকেও দাশ সাহেবের প্রয়োজন হয়। আমরা সব ইতর জন যারা আছি তারা কখনও দাশ সাহেবের ঘরে ঢুকতে পাইনে, কারো সঙ্গে তিনি কথা বলেন না।

সে সময় আমাদের অফিসে টিফিনের কোনো পৃথক্ ঘর ছিল না। যখন দুপুরের দিকে একবার সময় পাওয়া যেত, বিরিঞ্চিবাবু একটা বেয়ারাকে ডেকে একটা পয়সা দিতেন মুড়ি আনতে। সেই বেয়ারাই আবার আমাদের সবার কাছে এসে পয়সা নিয়ে গিয়ে কারো জন্যে মুড়ি-বাতাসা, কারো জন্যে ছোলা-ভাজা, কারো জন্যে মুড়ি-মুড়কি এমনি সব এক এক পয়সার ঠোঙা সাজিয়ে নিয়ে আসত এবং বিরিঞ্চিবাবুর মতো আমরাও যে যার টেব্‌লের দেরাজে ঠোঙা রেখে আমাদের টিফিন সারতাম।

একদিন তেমন ভাবেই টিফিন সারা চলছে এমন সময় দাশ সাহেব বাইরে থেকে এলেন। বরাবর তিনি গট্‌গট করে তাঁর চেম্বারে চলে যান, সেদিন কিন্তু যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। যে যার চেয়ারে বসে মুখ চালাচ্ছি। এক, দুই, তিন, চার—সব্বাই, এমন কি বিরিঞ্চিবাবু পর্যন্ত! দাশ সাহেব সোজা গিয়ে বিরিঞ্চিবাবুর টেব্‌লের সামনে হাজির। বিরিঞ্চিবাবু উঠে

দাঁড়ালেন এবং তাড়াতাড়িতে হাতের ঠোঙাটা টেব্‌লের উপর পড়ে মুড়ি সব ছড়িয়ে গেল। বেয়ারারা তটস্থ হয়ে উঠল, পাখার বাতাসে সাদা মুড়ি কাগজপত্রের মধ্যে উড়ে যাচ্ছে। আমরা তো হাতের গ্রাস আর মুখে তুলতে পারিনে। ভেবে দেখ অবস্থাটা। বড়বাবু আর বড়সাহেব—একজন টেব্‌লের এ পাশে, আর একজন টেব্‌লের ওপাশে। বড়বাবুর যেন কতবড় একটা অপরাধ ধরে ফেলেছেন এমনভাবে বড়সাহেব বললেন—হোয়াট্‌স্‌ ছাট্‌?

'মুড়ি'—সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন বিরিঞ্চিবাবু।

দাশ সাহেব বড়সাহেবী সুরে ইংরেজিতে বললেন—এই 'ভাজা চাল' আপনারা খান? আর সেই জন্যেই এই চেহারা! খাটবেন কি করে শুনি? চল্লিশ পার হতেই চোখে চালশে ধরে, মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যায়, এর কারণ এই মুড়ি। জঘন্য জঘন্য—

একটা ঘৃণাসূচক শব্দ করে দাশ সাহেব সে স্থান পরিত্যাগ করলেন।

আমরা যে যার টেব্‌লে কাঁটা হয়ে বসে আছি, মুখের মুড়ি ভয়ে চিবুতে পারিনি, হাতের মুড়ি কখন ঠোঙায় রেখে দিয়েছি টেরও পাইনি। দাশ সাহেব চলে যেতে অফিসময় একটা গুঞ্জন উঠল। আমরা কেউ কেউ উঠে বিষয়ী বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনিও রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দীর্ঘ চাকুরি-জীবনের ইতিহাসে এ ব্যাপার নতুন, তাই হতভম্ব হওয়ারই কথা। কিন্তু আমাদের সবার হতভম্ব ভাব কাটতে না কাটতে দাশ সাহেবের বেয়ারা এসে বিষয়ী বাবুকে সাহেবের

সেলাম জানালো। তখনো তাঁর টেব্‌লের উপর মুড়ি ছড়িয়ে আছে। বড়বাবু সব ঠেলে রেখে বড়সাহেবের ঘরে গেলেন।

দশ মিনিট বিশ মিনিট করে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রায় আধ ঘন্টা সময় কাট্‌ল, তারপর এলেন বড়বাবু বেরিয়ে। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা ভরসা পেয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বড়বাবু বল্লেন—সব চার্ট করা হয়ে গেল, বাঙালীর আদর্শ টিফিন দাশ সাহেব যা ঠিক করে দিলেন এ একেবারে ইন্‌টারন্যাশনাল ভিটামিন কন্‌টেণ্ট চার্ট।

সবাই আগ্রহী হয়ে বললাম—ব্যাপার কি?

মুড়ি।

বিষয়ী মশাই টেব্‌লের উপরে রাখা মুড়ির ঠোঙাটা এবারে সজোরে ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে নিক্ষেপ করলেন। তারপর চেয়ারে বসে বল্লেন—সে সব গুরুতর ব্যাপার হে ছোকরারা। দাশ সাহেব অনেক পড়াশুনো করেন, বইপত্র দেখিয়ে দিয়ে বোঝালেন, মুড়িতে ভিটামিন নেই, প্রোটিন নেই, কার্বোহাইড্রেট যা আছে তাও ভাজাভাজিতে বিষাক্ত হয়ে গেছে। আর তার ক্যালোরিফিক ভ্যালুও অত্যন্ত নগণ্য। মুড়ি খাওয়া তো নয়—পয়সার মুড়ো খাওয়া। বাজে খরচ!

কে একজন চাটুজ্জে মশাইকে বাধা দিয়ে বল্লে—কিন্তু পি, সি, রায় যে বলেছেন,—মুড়ি খাওয়া উপকারী।

চাটুজ্জে মশাই বললেন—আমরা কি তখন বাপু পি, সি, রায়ের বক্তৃতা জানি, না তোমাদের মতো এত ডেঁপোমি শিখেছি! সাহেব বলছেন, বড়বাবু বলছেন—সুতরাং সে কথা শিরোধার্য করে নিতে হবে। তারপর শোন গল্পটা।

বিষয়ী মশাই বললেন—অতএব বাবুদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে দাশ সাহেব তখুনি একটা চার্ট করে ফেললেন।

চার্টটায় কি আছে জানবার জন্যে আমরা অধীর হয়ে উঠলাম। বড়বাবু বললেন—দাশ সাহেব চার্টটা আর একবার অবসর মতো আলোচনা করে দেখবেন এবং তাঁর বন্ধু বিলিতি ডাক্তার ক্যাপ্টেন হচ্‌পচ্‌কে দেখাবেন। দাশ সাহেব যা করেন সব পাকাপাকি ভাবে করেন। তবে আপাতত তিনি লিখেছেন জনপ্রতি প্রত্যহ টিফিনে এই সব খাদ্য খাওয়া দরকার—

১টা ডিম সিদ্ধ
২টা কলা
১টা কমলা লেবু
½টা শশা
১টা গাজর
১টা টম্যাটো
১ কাপ ওভালটিন, অভাব পক্ষে দুধ।

হিসেব করে দেখা গেল তখনকার দিনেও কম পক্ষে চার পাঁচ আনা না হলে এমন টিফিন খাওয়া চলে না। অথচ আমাদের বড়বাবুরও এমন বেতন নয় যে দৈনিক এত পয়সা খরচ করে টিফিন খান। একমাত্র দাশ সাহেবের টিফিনের খরচা কোম্পানি বহন করত। আমরা সবাই পরামর্শ করে স্থির করলাম—সবাই মিলে একখানা যৌথ আবেদন করা যাবে, টিফিনটা যাতে অফিসের খরচাতেই পাওয়া যায়। উৎসাহে সেদিন আর বাকি মুড়িটা কেউ খেলে না।

পর দিন অফিসে গিয়েই একটা সম্মিলিত আবেদন পেশ করা গেল। বড়বাবু সেটা দাশ সাহেবের কাছে ফরোয়ার্ড করে পাঠাতে চেয়েছিলেন, তারপর কি ভেবে নিজেই হাতে করে নিয়ে গেলেন। আবেদনের ভাবটিতে বড়বাবু সাহস পেয়েছিলেন, কেননা কলিযুগে আমাদের উদ্ধার করবার জন্যেই যে দাশ সাহেব জন্ম নিয়েছেন এবং বিনামূল্যে টিফিন প্রদানের ব্যবস্থারূপ পুণ্যকর্ম যে তাঁকে অশেষ আয়ু, অঢেল ধন-দৌলত এবং ভগবানের আশীর্বাদের পাত্র করবে এ বিষয়ে আমরা পুনঃ পুনঃ স্বীকারোক্তি করেছিলাম। বড়বাবু খুব আশা নিয়ে ফিরে এলেন। উৎসাহে আনন্দে সেদিন আর কেউ টিফিন খেলাম না।

এক দিন দুই দিন করে সপ্তাহ ঘুরে গেল। অনুমোদিত ফলারের তালিকাটাও ফিরে আসে না, আমাদের আবেদনের জবাবটাও পাওয়া যায় না। খোঁজ নিয়ে জানি আবেদনটা আছে দাশ সাহেবের টেব্‌লে। বড়বাবুকে বল্‌লে বলেন—ক্যাপ্টেন হচ্‌পচকে ধরা যাচ্ছে না বোধ হয়, তাই দেরি হচ্ছে। ক্রমে দু' সপ্তাহকাল কাটল। বড়বাবুর স্তোকবাক্যে আর মন মানে না, অথচ ভদ্রলোককে অবিশ্বাস করতেও পারিনে। আমাদের সঙ্গে তিনি নিজেও টিফিন খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

মন যদিও বিচার করে, শরীর সে-কথা শুনতে চায় না। দ্বিপ্রহরের সূর্য পশ্চিম দিকে হেললে আমাদের উদরে তার তির্যক রশ্মির তাপ অনুভব করতে থাকি। ক্রমে তা অসহ্য হয়ে ওঠে। বেয়ারা পাঠিয়ে আনতে ভরসা হয় না, নিজেরা গোপনে গোপনে গিয়ে দু এক পয়সার যা হোক কিছু খেয়ে আসি। ক্রমে কিছু আনিয়ে অফিসে বসেই গোপনে খাওয়ার অভ্যাস হয়ে গেল।

একটু জুতোর শব্দ শুনলেই মুখের মধ্যে মুড়ি চিবোনো বন্ধ রাখি, কি জানি কখন দাশ সাহেব দেখে ফেলেন আমরা ক্যালোরিহীন মুড়ি খাচ্ছি আর খচ্ করে ফ্রি টিফিনের আবেদনটা নামঞ্জুর হয়ে যায় সেই ভয়ে সবাই কাঁটা হয়ে আছি। নিজেদের পয়সায় খাবার কিনে চোরের অধিক ভয়ে ভয়ে এ'দিক ওদিক তাকিয়ে গো-গ্রাসে কোনক্রমে গিলে ফেলে উদর ঠাণ্ডা করি। গো-গ্রাস কথাটা ভাষায় বৃথাই ব্যবহার হচ্ছে, কেননা চেষ্টা করেও রোমন্থন করবার পদ্ধতিটা অভ্যাস করতে না পারায় অনেকেই এই কসরতে অজীর্ণ রোগে ভুগতে লাগলাম। তবু ক্ষীণ আশা ছাড়তে পারিনে—ফ্রি টিফিনটা নিশ্চয় পাশ হয়ে যাবে!

বড়বাবু অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত আবার মুড়ি ধরলেন এবং আমাদের মতো লুকিয়ে না খেয়ে প্রকাশ্যেই খাওয়া সুরু করলেন। ফল অচিরেই ফল্ল—ঘ্যাচাং করে দাশ সাহেব আবার একদিন ধরে ফেললেন—আবার মুড়ি খাচ্ছেন আপনারা? বাঙালী মরলই তো মুড়ি খেয়ে আর ম্যালেরিয়ায় ভুগে। এই যে প্রাণ-শক্তিহীন খাবার খেয়ে আপনারা এফিসিয়েন্সি খোয়াচ্ছেন এতে কোম্পানির কাজ সাফার করে সেটা বিবেচনা করেছেন? এমন টিফিন খেলে আপনাদের আমি কাজে রাখতে পারব না। তা ছাড়া আমি যখন একটা বৈজ্ঞানিক তালিকা আপনাদের দিয়েছি সেটা 'ফলো' না করার অর্থ আমাকেই অসম্মান করা।

বড়বাবু বললেন—আমরা তো স্যার সেই তালিকার আশাতেই বসে আছি। আপনি বললেন—ক্যাপ্টেন হচ্‌পচ্‌কে দেখিয়ে—

ওঃ—দাশ সাহেবের মনে পড়ে গেল। আসুন আমার সঙ্গে। লিস্ট দিয়ে দিই। আর লিস্ট দিলেই কি আপনারা করতে

পারবেন, আমিই দিচ্ছি সব ব্যবস্থা করে। বলে তিনি বড় বাবুকে নিয়ে নিজের চেম্বারে চলে গেলেন।

পরদিন ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজতে না বাজতে চার পাঁচ জন বেয়ারা এসে বাবুদের টেব্‌লে কাঁটা চামচ সাজিয়ে প্লেট ভরে দিয়ে গেল—

১টা ডিম সিদ্ধ
কলার কুচি
শশার কুচি
টম্যাটোর কুচি
এক স্লাইস রুটি—মাখন চিনি মাখানো
আর মাঝারি এক গ্লাস দুধ।

আমরা খেয়ে বলাবলি করতে লাগলাম,—যাই বলো, দাশ সাহেবের নজর আছে। একজন বললেন, দেখলে হে, এ'কেই বলে স্বজাতিপ্রীতি। বাঙালী না হয়ে উনি যদি সত্যি সাহেব হতেন তবে কি আমাদের জন্যে এত কিছু করতে যেতেন? আর একজন বললে, আসল কথা হ'ল—শিক্ষা। দাশ সাহেব যদি আমেরিকা থেকে বিজ্ঞান শিখে না আসতেন, তবে কি মুড়ির মধ্যে কিছু পদার্থ নেই একথা জানতে পারতেন? সেই যে পিতামহের আমল থেকে মুড়ি চলছে আমরা তাই জেনেই বসে আছি। আরে আমাদের পিতামহদের কি রোজ এত ব্রেন্‌-ওয়ার্ক করতে হ'ত?' ভদ্রলোক ডেবিট ক্রেডিট করে করে মাথার চুল ক'টি ফেলে একমাথা টাক বানিয়েছেন। ব্রেন-ওয়ার্কের মর্মটা তাঁর সত্যি বেশি জানবার কথা। যাই হোক আমরা দাশ সাহেবের

এই মহান্ জাতীয়তা-বোধের প্রতিদান স্বরূপ এ মাসে বেতন পেয়ে সবাই চাঁদা তুলে তাঁর ঘরে এক ভেট পাঠাবার লিস্ট তৈরী করে ফেললাম—

এক জোড়া মোরগ
এক কাঁদি কলা
এক কুড়ি ডিম
এক শত কমলালেবু
এক ঝুড়ি টম্যাটো
—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেতন না পাওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ এই লিস্টের আইটেম বাড়তে থাকল। মেমসাহেবের জন্যে কি দেওয়া যায়, ছেলেমেয়েদের জন্যে কি দেওয়া যায়, সব কিছুর আলাদা আলাদা ফর্দ এক একজনের পকেটে পকেটে ঘুরতে লাগল। দাশ সাহেবকে দেখলে আগে আমরা ভয়ে সরে আসতাম, এখন ভক্তিতে সরে আসি। হৃদয় গদ্‌গদ্ হয়ে উঠতে না উঠতে তিনি গট্ গট্ করে চলে যান।

পূর্ণেন্দু সেন বল্লে—চাটুজ্জে মশাই, এর মধ্যে অ্যাটম্ বম্ কই?

চাটুজ্জে মশাই বল্লেন—ও সব অ্যামেরিকান চিজ্, ও কি জানিয়ে শুনিয়ে পড়ে হে ছোকরা, আকস্মিক ভাবেই পড়ে, আর পড়লে ছোট বড় সবাইকে একসঙ্গে কাৎ করে। আমাদের ওখানেও অ্যাটম্ বম্ পড়ল। পরের মাসে মাইনে দেওয়ার সময় ক্যাশিয়ার সবার নামে ৮।৶০ করে এক বিল বের করলে— টিফিন চার্জ! হিরোসিমায় বোমা পড়ায় লোকজন কেমন হয়েছিল

কেউ বলে যেতে পারেনি, আমাদের সেদিনকার অবস্থাও অবর্ণনীয়। ২৫৲।৩০৲ টাকা বেতন, সারা পরিবারের সমগ্র মাসের সম্বল, তার থেকে ৮।৶/০ কাটা মানে কয়েকদিন নির্ঘাত অনাহারে থাকা। বড়বাবুর অবস্থা সবচেয়ে কাহিল, যদিও তিনিই সবার চেয়ে বেশি বেতন পেতেন। তাঁকে দিয়ে আর কিছু সুরাহা আশা করা বৃথা। তবু ক্যাশিয়ারকে কারা বুঝি বললে—তারা বেতন নেবে না। ক্যাশিয়ার গিয়ে সে কথা দাশ সাহেবকে বলায় তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে একখানা অ্যামেরিকান সুপার ফোর্ট্রেস্-এর মতো চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, এসে হেঁকে বল্লেন, বিলের টাকা দেবেন না এ কি গায়ের জোরের কথা? খাননি সবাই রোজ পেট ভরে টিফিন? লিস্ট করে দিলেও ফল হবে না বলে কো-অপারেটিভ সিস্টেমে রাশিয়ায় যেমন ভাবে খাওয়া-দাওয়া হয় সেই ভাবে সবার জন্যে একসঙ্গে ফল কিনে ভাগ করে দিয়েছি, তাতে কত সস্তায় পড়েছে সে হিসেব রাখেন? কোম্পানি যে টাকাটা ইনভেস্ট করলে তার ইনটারেস্ট কে দেয়? Ungratetul people! এই জন্যেই তো বাঙালীর জন্যে কিছু করতে নেই, এই জন্যেই বাঙালীর উন্নতি হয় না। Ungrateful people! কথাটা তিনি পুনরুক্তি করে সশব্দে চেম্বারে ফিরে গেলেন।

অফিসে কোথাও টুঁ শব্দটি নেই, যে যার সীটে চুপচাপ বসে আছি। বেঁচে আছি কি মরে গেছি জানতেও কিছুটা সময় গেল। অ্যাটম বমের ক্রিয়া যে সর্বব্যাপী তা সেদিনই জানলাম। বাপ রে, একে অ্যামেরিকান ক্যালোরি-ভ্যালু চার্ট, তায় রাশিয়ান কো-অপারেটিভ সিস্টেমের যোগাযোগ। জাপানের যুদ্ধে এই

যোগাযোগ এতদিন ঘটেনি বলে অ্যাটম্ বোমাও পড়েনি। যখনি কাগজে দেখলাম জাপানের বিরুদ্ধে আমেরিকার সঙ্গে একযোগে রাশিয়াও যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তখনি তাই এঁচেছিলাম—এবার নির্ঘাত অ্যাটম্ বম্ আসছে।

লার্জ স্কেল স্টোরি মেকিং ফ্যাক্টরি

একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিতেছি, অবধান করুন।

কিঞ্চিৎ রসের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম।

ঘাবড়াইবেন না, কমলাকান্তের গব্যরসের সন্ধান নহে, কারণ একথা নিশ্চিত জানি, সোমরস মিলিলেও মিলিতে পারে, কিন্তু খাঁটি গব্যরস অমৃতের মতো সমুদ্র মন্থন না করিলে মিলিবে না। অবশ্য একথাও সত্য যে, সোমরসের সন্ধানেও বাহির হই নাই। জানি, দিশি জিনিসে সকলের তৃষ্ণা নিবারিত হয় না, বিলাতি আমদানির উপর কড়া খবরদারি বসিয়াছে, সুতরাং যাহা ছিটে-ফোঁটা সেই রস মিলে, অর্থাৎ কালোবাজারের ঘোরা পথ ডিঙাইয়া রসিকজনের টেবিলের পেগে হাজির হয়, তাহা আর অরসিকেষু অপব্যয় না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পল্লীগ্রামের পাঠক হয়তো ভাবিতেছেন, আমি খেজুর রসের সন্ধানেই বাহির হইয়া থাকিব। দেখুন,—খেজুর, তাল বা নারিকেল, যে রসই আনুন না কেন, পরিবেষণে বিলম্ব ঘটিলেই গাঁজিয়া উঠিবে এবং উৎকট মাদকতার সৃষ্টি করিবে। এই গাঁজিয়া ওঠাটাই ভয়ানক। আমি চাই এমন রস যাহা পরিবেষণে যতই বিলম্ব করুন, নষ্ট হইবার ভয় নাই; অর্থাৎ তাহা আমাকে মজাইলেও নিজে গাঁজিবে না।

এবার পাঠক বোধহয় আমার অনুসন্ধানের ইঙ্গিত বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, নহিলে অমন টিপি টিপি হাসিতেছেন কেন? দুঃখের বিষয়, কাব্যরসের কথা যদি ভাবিয়া থাকেন, যাহা শত শতাব্দী অতিক্রম করিয়া তাহার মাদকতা বিস্তার করিতে পারে,—যেমন কালিদাসের কাব্য, শেক্সপীয়রের নাট্য কিম্বা দাঁতে, গ্যেটে প্রভৃতির রচনা,—আমি সে রসের কথাও বলিতেছি না। কারণ কি জানিতে চাহিতেছেন? কারণ তো জানেনই, তবে কেন আর আমার মুখ দিয়া কথাটা বাহির করিয়া কবিজনের কটাক্ষভাজন করেন? তাহারা এখনই সাম্প্রতিক কবিতা শানাইয়া আপনাদের সুদ্ধ আমাকে আক্রমণ করিয়া বসিবেন এবং মুহূর্তে এমন সব আঙ্গিকের শরসন্ধান করিতে থাকিবেন যে আপনারা ছুটিয়া অভিধান ও অন্যদেশীয় সাহিত্য-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া অর্থসন্ধানের ব্যর্থ প্রয়াসে হাবুডুবু খাইতে থাকিবেন।

আমি কিছু প্রাণরসের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম।

কথাটায় খটকা লাগিল নাকি? প্রাণ যে কিরূপ বস্তু আপনারা দেখেন নাই, আমিও দেখিয়াছি বলিয়া আপনাদের ধোঁকা দিব না। কিন্তু প্রাণরস কি বস্তু তাহা আপনারাও জানেন, আমিও কম জানি না। 'সিলভার টনিক' নামক ঔষধটির কথা শুনিয়াছেন কি? হয়তো শুনিয়াছিলেন, এখন ভুলিয়া গিয়াছেন। কারণ, ওই ঔষধটির উপাদান-পরিবর্তন হইয়াছে, তাই নামটাও 'নিকেল টনিক' কিংবা 'পেপার টনিক' রাখা হইয়া থাকিবে। 'নিকেল টনিক' নামটাও মনোরম, কারণ কেবল যে ন-এর অনুপ্রাস আছে তাহাই নয়, নিকেল যত নিঃশব্দই হোক কাগজের অপেক্ষা

বাঙ্‌ময় এবং কাগজের অপেক্ষা ভাস্বর। 'নিকেল টনিক'-এর বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় ভাবানুবাদ—প্রাণরস।

রসের সন্ধান করিতে করিতে এক জায়গায় হদিশ মিলিল। হারাধন হাবিলদার মহাশয়ের দুয়ারে এক দিবস ধর্না দিলাম। তিনি এ যুগের উদীয়মান সাহিত্যিক, আমি তাঁহার P. A. নিযুক্ত হইলাম।

হারাধন হাবিলদার এবারের বিশ্বযুদ্ধের দৃশ্যে বিশেষজ্ঞ। তিনি স্বয়ং একটা রেজিমেণ্টের টাইপিস্ট হইয়া ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে উঁকি মারিয়া আসিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়া যেই কলম বাগাইয়া ধরিয়াছেন অমনি এক খোঁচাতেই বঙ্গভারতীর পূর্বসাধকদের পূজা-আরতির নির্মাল্য ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া নিজে একেবারে যাকে বলে—পুরোধা, তাই।

অবশ্য তাই তিনি বিশ্বভাষায় কবিতা না লিখিয়া বঙ্গভাষার উন্নতি বিধান করিতেছেন এবং যখন আমাকে পি, এ, বলিয়া সম্বোধন করেন তাহা সুমিষ্ট 'পিয়ে' সম্বোধনের মতোই শোনায়।

আপনাদের কাছে গোপন করিব না, আমার কিছু সাহিত্য-রোগ ছিল, অর্থাৎ কলেজ ম্যাগাজিনে কবিতা, সাপ্তাহিক কাগজে প্রবন্ধ এবং মাসিক কাগজে আমার কিছু কিছু গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সেই ঝুটা খ্যাতি সম্বল করিয়াই চাকুরিটি বাগাইলাম।

জ্যৈষ্ঠ মাস, নিদাঘ দ্বিপ্রহরে ঘামিতে ঘামিতে হাবিলদার মহাশয়ের 'পিয়ে' সম্বোধনের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিতাম এবং টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একই রচনার অনেকগুলি নকল করিতাম।

তবে কাজটা মাছিমারা কেরানির নয়, কেননা, রচনা মূলত এক হইলেও কোথাও তাহা বাড়াইয়া পঞ্চাশ টাকার উপযোগী করিতে হইত। পৃষ্ঠা বৃদ্ধির কতকগুলি উপাদান হাতের কাছেই গচ্ছিত থাকিত, যথা—কিছু প্রাকৃতিক বর্ণনা, কিছু নারীদেহের রূপ বিশ্লেষণ, কিছু শ্রমিক-আন্দোলন-আলোচনা, কিছু সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার গুণগান এবং কিছু যুদ্ধ ও তদ্দরুন নানা উৎকট অবস্থার বর্ণনা। আমার কাজ—সেগুলি গঁদ দিয়া জোড়াতাড়া লাগাইয়া দেড় পৃষ্ঠার গল্পকে তেত্রিশ পৃষ্ঠায় পৌঁছাইয়া দেওয়া।

এ গেল একদিক। আরও কাজ আছে।

সাধারণ গল্পকে ছাঁটিয়া ও দু'একটি চরিত্র বেমালুম লোপ করিয়া, কোথাও বা জড় পদার্থকে দিয়া কথা কহাইয়া ছোটদের সংস্করণ করিতে হইত। এবং 'সিনেমা-সংস্করণ-স্বত্ব-সংরক্ষিত' বলিয়া প্রকাশ করিয়া যদি সিনেমা প্রোডিউসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় এজন্য কোনো কোনো গল্পের নাট্য এবং চিত্র-রূপের খসড়াও আমাকে করিতে হইত।

অর্থাৎ এক প্রিয়াকেই নানা পরিচ্ছদে নব নব রূপে দেখিবার আগ্রহের মতো হাবিলদার সাহেবের এই উৎকট আগ্রহ আমাকে পূরণ করিতে হইত, কিন্তু আমি ইহার সার্থকতা বুঝিতে পারিতাম না।

ক্রমে গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা আসিল, দিকে দিকে সবুজের সমারোহ দেখা দিল। নূতন ব্যাঙাচি ও ব্যাঙের ছাতা জন্মিল এবং বাংলা দেশের দিকে দিকে নিত্য নূতন পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব হইতে লাগিল। একে পূজা আসিতেছে, তাহে স্বাধীন ভারতের পূজা, সুতরাং ছোটবড়ো সকল কাগজেরই পূজা-সংখ্যা প্রকাশের আয়োজনে লোক মত্ত হইয়া উঠিল।

এইবার আমার সত্যদৃষ্টি খুলিবার সুযোগ আসিল। কয়েকমাস অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যে রচনাগুলি প্রস্তুত করিয়াছিলাম তাহা আমিও দ্বিতীয়বার পড়িয়া দেখিবার সুযোগ পাই নাই; হাবিলদার মহাশয় তো কখনোই দেখিতেন না, আমি রামের সহিত সীতার বিবাহ দিতেছি কি ঊর্মিলার বিবাহ দিতেছি। আমাকে তিনি একটা গড়পড়তা হিসাব শিখাইয়া দিয়াছিলেন এবং আমিও সেই মাপে রচনাগুলি মাপিয়া মার্কা মারিয়া মূল্য ফেলিয়া রাখিতাম।

যথাসময়ে 'হাবিলদার হাউসে' প্রকাশক, সম্পাদক, সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিকদের ভিড় বাড়িতে লাগিল এবং আমিও তাহার উপযুক্ত 'পিয়ে'-র মতো কাজ করিতে লাগিলাম। অর্থাৎ এক হস্তে অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিলাম এবং অর্থের পরিমাণ মতো রচনা বণ্টন করিতে লাগিলাম। ছোটদের কাগজে বড় গল্পের ছোট সংস্করণ, সিনেমা-পত্রিকায় সিনেমা সংস্করণ, মহিলা পত্রিকায় স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জিত সংস্করণ এবং কিশোর পত্রিকায় পুরুষ-ভূমিকা-বর্জিত সংস্করণ বিতরণ করিলাম। মূল গল্পগুলির কিছু তখনো বাঁচিয়া গেল দেখিয়া সেগুলি আগামী বৎসরের পূজা-সংস্করণের জন্য সিলমোহর করিয়া তুলিয়া রাখা হইল।

বুঝিয়াছিলাম, পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হইবার পূর্বে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা দরকার। তাহাতে বিলম্ব করি নাই। কারণ পূজার দর্শনীর মোটা অঙ্ক পাইয়া হাবিলদার মহাশয় হাওয়াই জাহাজে হনলুলু রওনা হইলেন। যাইবার সময় আমার পারিশ্রমিকের কথা ভুলিয়া গেলেন, বোধহয় শেষ পর্যন্ত দিবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কিন্তু তাহাতে দুঃখ করিতে বসিয়া লজ্জা বাড়াইলাম না। তিনি আমাকে যে অমূল্য সম্পত্তির অধিকারী করিয়া দিয়া

গিয়াছেন তাহা হইল—এক মুরগী দশ জায়গায় জবাই করিবার কৌশল। ঢালিয়া সাজিবার এবং সাজিয়া ঢালিবার সেই গুপ্ত কৌশল সম্বল করিয়া আমি প্রাণরস আহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং বাংলাদেশের দুঃখ মোচনের জন্য "লার্জ স্কেল স্টোরি মেকিং ফ্যাক্টরি" খুলিয়াছি। এবারের পূজা-সংখ্যাগুলি খুঁজিলে আমাদের ফ্যাক্টরির কাজের অনেক চমৎকার নিদর্শন মিলিবে।

ময়ূরপুচ্ছ

বিবাহের সময়েই বনলতা শুনিয়াছিল তাহার স্বামী শুধু মুনসেফ নহেন, একজন প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক। স্বামীর গৃহে আসিয়া দেখিল মাসে মাসে কত পত্রিকায় তাহার স্বামীর রচনা মুদ্রিত হইয়া আসে। দেখিয়া তাহার যে শুধু গর্ব বোধ হইল তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সামান্য ঈর্ষ্যাও বোধ হইল। বনলতা কলেজ ম্যাগাজিনে কবিতা প্রকাশ করিতে পারে নাই, কারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে না হইতেই বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু দু' একটি রচনা সে লিখিয়া রাখিয়াছিল, ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার জন্য। একদিন সসঙ্কোচে তাহাই স্বামীর কাছে হাজির করিয়া বলিল, এগুলি একটু ছাপিয়ে দাও না, কত কাগজের সঙ্গে তো তোমার আলাপ।

আলাপ থাকিলেই তো আর প্রলাপ ছাপিতে পাঠানো যায় না, কাজেই স্বামীকে সেটি কাটিতে হইল এবং কাটাকাটি অন্তে অবস্থাটি যাহা দাঁড়াইল তাহাতে কেবল মূল রচনার লেখিকার নামটি ব্যতীত অপর কিছুই রহিল না। সেটি ছাপা হইল এবং ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখিয়া বনলতা অত্যন্ত আনন্দিত হইল। পত্নীর কাছে পুরস্কারের পরিমাণ আশাতীত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কারণ পরদিন মুনসেফ সাহেব কাছারি হইতে ফিরিয়া আর ক্লাবে না যাইয়া সন্ধ্যাতেই আর একটি গল্প লিখিয়া ফেলিলেন এবং তাহাও প্রকাশের জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর

পত্রিকায় প্রেরিত হইল। বলা বাহুল্য রচয়িত্রীর স্থানে বনলতার নামই থাকিল। তারপর ব্যাপার এই ঘটিল যে, স্বামী ভাবিলেন স্ত্রী যদি ইহাতেই সুখী হয় তবে আমার রচনাগুলি না হয় তাহার ছদ্মনামেই বাহির হইল, ক্ষতি কী! কিন্তু স্ত্রী ভাবিলেন—আমি কি হনু রে! দ্বিপ্রহরে যখন কোনো উকিলের স্ত্রী বেড়াইতে আসেন এবং প্রথানুযায়ী অনুযোগ করেন, আজকাল ভাই আর যান না আমাদের ওদিকে—বনলতা একটা প্রচণ্ড হাই তুলিয়া আড়মোড় ভাঙিয়া জানায়, সময় কখোন পাব ভাই। এই দেখুন না—'কলকাতা' কাগজ থেকে জানিয়েছে—১৩ তারিখের মধ্যে তাদের একটা গল্প অবশ্যই চাই! 'না' বলতে পারিনে, দেখে যখন আর দশটা কাগজে লিখছি—তাদের কাগজেই বা কেন লিখব না, আর লেখাটা পেলে টাকা পাঠায়। এই মাগ্যিগণ্ডার দিন—তাও বা আসে কোত্থেকে, কি বলেন?

উকিলগিন্নিরা একটুক্ষণ বসিয়া পান খাইয়া উঠিবার সময় বলেন, যাই ভাই, আপনার অনেক সময় নষ্ট করে গেলাম। এতক্ষণে আপনার একটা গল্প লেখা হয়ে যেত।

তাহারা চলিয়া গেলে বনলতা বিছানায় লম্বা হইয়া পড়িয়া মাসিক পত্রিকার পাতা উলটায়। তাহার নামে যে সব রচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সবগুলি সে এখনো পড়িয়া দেখিতে সময় পায় নাই। কাগজের পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে কখন সে নিদ্রায় অভিভূত হয় জানিতে পারে না। ঝি আসিয়া ডাকিলে জাগিয়া ঠাকুরকে জলখাবার করিতে বলিয়া নিজে গা ধুইতে যায় এবং প্রসাধন সারিয়া জলখাবার লইয়া স্বামীর প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এখনো তাহার সন্তানাদি হয় নাই, সুতরাং স্বামী না

ফেরা পর্যন্ত একা একাই শয়নকক্ষে এটা ওটা গুছাইতে থাকে। ঘরটি ফিটফাট রাখিতে, গৃহস্থালী কর্ম করিতে সে যত আনন্দ পায় লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করিতে পূর্বের মতো আর ভালো লাগে না।

ধীরেন সেন উকিলের মেয়ে কলকাতায় কলেজে পড়ে, সে বাড়ি আসিয়াছে। তাহাকে লইয়া তাহার মা একদিন দ্বিপ্রহরে বনলতার নিকট আসিলেন এবং তাহার কন্যাটি যে বনলতার সব লেখা অত্যন্ত আগ্রহে পড়ে এই কথা জানাইলেন। আলাপ তখন তাঁহার মেয়ের সহিত হইতে লাগিল। তাহার নাম বনশ্রী।

বনশ্রী বলিল,—আপনি 'কলকাতা'-র পৌষ সংখ্যায় যে গল্পটি লিখেছেন, আমার অত্যন্ত ভালো লাগল। ঐ যে মৃত্তিকা নামে মেয়েটি, ওকে যেন আমি দেখছি মনে হয়—এত জীবন্ত ওর চরিত্র। সত্যি ধন্য আপনার রচনাশক্তি।

বনশ্রীর মা শুনিয়া বলিলেন—মেয়ের নাম আবার মৃত্তিকা, সে কি রে!

বনশ্রী বলিল—ও তোমরা বুঝবে না মা, একি তোমাদের যুগের নিস্তারিণী, ক্ষেমঙ্করীর মতো নাকে নোলক-পরা তিনহাত ঘোমটা দেওয়া মেয়ে? মৃত্তিকা মাটির মতো সরস, মাটির মতো মমতাময়ী, আবার মাটির মতো বিস্তৃত, তাইতো সকলের আয়ত্তের বাইরে। কেউ তাকে সম্পূর্ণভাবে পেতে পারে না। মাটি সে মাটিই রয়, আমি তুমি দু'দিনের। বড় appropriate নাম দিয়েছেন—'মৃত্তিকা'। অন্য কোনো নামে ওকে মানাত না।

বনলতা বিপদ গনিতেছিল। 'কলকাতা'র পৌষ সংখ্যা আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকাশিত তাহার নামের গল্পটি

তো পড়িয়া দেখা হয় নাই। মৃত্তিকা নামে একটি মেয়ে তাতে আছে এই পর্যন্ত বনশ্রীর কথায় জানা গেল, গল্পের গতি কোন্ দিক গিয়াছে যদি সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করিয়া বসে তবেই তো মহা বিপদ। অকস্মাৎ তাহার মাথায় একটা উপস্থিত-বুদ্ধি খেলিয়া গেল, সে বলিল—ওসব কথা এখন বোলো না ভাই, রাতদিনই তো কেবল আমার লেখার সমালোচনা শুনতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ভাবি,—লেখা ছেড়ে দেব।

বনশ্রী বলিল, না না, কক্ষনো হতে পারে না; আপনি লেখা ছাড়তে পারেন না। বাংলা সাহিত্য আপনার কাছে অনেক প্রত্যাশা করে।

বনলতা কথাটা আর এক বাঁক ঘুরাইল—বলিল, চলো ভাই আমরা ও ঘরে যাই। মাসিমা, আপনি বরং একটু বিশ্রাম করুন বা এই দুই একখানা বইপত্র নাড়াচাড়া করুন, আমরা আসছি।

পাশের ঘরে আসিয়া বনলতা নিজ হস্তে খাবার প্রস্তুত করিতে বসিল। আজ তাহার ভদ্রতাজ্ঞান টন্ টন্ করিতেছে। মাসিমা ও বনশ্রীকে একটু মিষ্টিমুখ করাইয়া না দিলে কি চলে? বনশ্রীও বনলতার কাজে সাহায্য করিতে লাগিল। লুচি বেলিতে বেলিতে বনশ্রী বনলতার দুই একটি পুরাতন গল্পের নায়ক নায়িকার কথা উল্লেখ করিলে বনলতা বলিল—কোথায় কবে কি লিখেছি সব কি এখন মনে আছে ভাই?

বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল, স্বামী ফিরিবার পূর্বে ইহাদের বিদায় দিতে পারিলেই বাঁচা যায়, না হইলে তিনি আসিয়া শুনিয়া ফেলিলে সব কথা ফাঁস হইয়া যাইবে। যা-হোক গুছাইয়া দিয়া বনলতা মাসিমা ও বনশ্রীকে খাইতে দিল এবং এখনই স্বামী

আসিয়া পড়িবেন, অনেক কাজ বাকি বলিয়া সত্বর তাহাদের আর একদিন আসিবার আমন্ত্রণ জানাইয়া বিদায় দিল।

পরদিনও দুপুরে বনশ্রী আসিল এবং অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে তাহার একটি কবিতার খাতা বনলতাকে দেখাইল, যদি সময় হয় একবার পড়িয়া প্রয়োজনীয় ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিতে। দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে খাতাটি বনলতা তুলিয়া রাখিল—সুবিধা মতো দেখিয়া দিবে কথাও দিল। কিন্তু বনশ্রী চলিয়া গেলে মুষড়িয়া পড়িল। স্বামীকে খাতাটি দেখানো কোনো ক্রমেই উচিত হইবে না। বনশ্রী যদি আসল বনলতার সন্ধান পায় তবে তাহার সম্মান নষ্ট হওয়ার অপেক্ষাও বড় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। বনশ্রীর বয়সটা বিবেচ্য। চেহারায়, চালচলনে কোথাও সে এতটুকু বন্য নয়, রীতিমতো শ্রীমণ্ডিত, তায় কলেজে পড়া মেয়ে! সুতরাং সময়াভাবের অজুহাতে খাতাটা চাপা রাখাই সঙ্গত বিবেচিত হইল।

কিন্তু বিপদ ইহাতেই কাটিল না। বনশ্রী প্রায়ই বনলতার সহিত গল্প করিতে আসিত। এখন সে একাই আসে, মায়ের সঙ্গে আসিবার অপেক্ষা রাখে না। অপরের মুখে সাধুবাদ শুনিতে ভালোও লাগে আবার বনশ্রী যে অফিসের দিনের মতো ছুটির দিনেও কখনো আসে ইহা বনলতা সমীচীন মনে করিল না। বনশ্রী এখানে একটি মহিলা সাহিত্য-সমিতি গড়িয়া তুলিতেছে—বনলতা তার সভানেত্রী, সেই সমিতির কাজ লইয়া বনশ্রী ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছে।

এমন সময় যখন স্বামী আসিয়া জানাইলেন, অফিসের গুরুতর প্রয়োজনে তাঁহাকে কয়েকদিনের জন্য কলিকাতা যাইতে হইবে,

বনলতা একা থাকিতে পারিবে কিনা, বনলতা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল; বলিল, সে খুব একা থাকিতে পারিবে।

কিন্তু কথায় বলে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। মুনসেফ সাহেব কলিকাতা রওনা হইবার পরদিনই শহরময় দেওয়ালে দেওয়ালে বড় বড় প্লাকার্ড মারা হইয়া গেল—প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শ্রীবনলতা দেবীর সভানেত্রীত্বে মহিলা সাহিত্য-সমিতির প্রথম অধিবেশন হইবে। সভায় উপস্থিত হইবার অধিকার কেবল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদেরই থাকিবে, তবে আগ্রহশীল শ্রোতাদের জন্য লাউডস্পীকারে বনলতা দেবীর বক্তৃতা শুনাইবার ব্যবস্থা থাকিবে।

বনলতা সব শুনিয়াছিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া ওজর-আপত্তিও করিতে পারিল না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিন ফুরাইতে লাগিল, সভার তারিখ যতই নিকট হইতে লাগিল ততই তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। কে যেন তাহাকে এক বিশাল মহীরুহে তুলিয়া দিয়া মই কাড়িয়া লইয়াছে। মনে মনে সে স্বামীর প্রত্যাগমন আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু এখন টেলিগ্রাম করিয়াও আনাইয়া তাহাকে দিয়া বক্তৃতার বিষয় লিখাইয়া লইবার সময় নাই। অথচ বনশ্রী দিনের ভিতর দশবার আসিতেছে, হাসিতেছে, উৎসাহের উত্তাল তরঙ্গে ভাসিতেছে। সে তো আর বুঝিতেছে না, তাহার উৎসাহের হাসি বনলতার বক্ষে শেলের মত তীক্ষ্ণভাবে বাজিতেছে। এই আনন্দের হাসিই যে মুহূর্তে বিকৃত হইয়া বিদ্রূপে পরিণত হইতে পারে তাহা ভাবিয়াই বনলতার আত্মারাম খাঁচা ছাড়িবার উপায় খুঁজিতেছিল।

দিন কাহারো জন্য বসিয়া থাকে না, ক্রমে সকাল গড়াইয়া দুপুর এবং দুপুর গড়াইয়া বৈকাল হইল। বনশ্রী সাজিয়া-গুজিয়া

বনলতাকে লইতে আসিয়া দেখে সে খাটের উপর জবুথবু হইয়া বসিয়া আছে। বনশ্রী আসিতেই যেন স্বপ্ন ভাঙিয়া উঠিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। বনশ্রা নিজের ইচ্ছামতো তাহাকে সাজাইল, তারপর গাড়িতে করিয়া সভার উদ্দেশে রওনা হইল।

সুন্দর সুসজ্জিত সভামণ্ডপ। বিশিস্ট ব্যক্তিরা সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। সভা গিস্‌গিস্‌ করিতেছে। যাহারা সাহিত্যামোদী তাহারা এতদিন এই প্রসিদ্ধা লেখিকার রচনাই পড়িয়াছে, এবার তাঁহাকে দেখিতে এবং মুখের বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছে। যাঁহারা সম্পদশালী তাঁহারা সাহিত্য-অসাহিত্যের ধার ধারেন না, সভা-সমিতি পাইলেই নিজেদের চাকচিক্য জাহির করিয়া আত্মপ্রচার করিতে পারিয়াই তুস্ট। বিশেষত গিন্নিদের সঙ্গে আনিতে পারায় কাহার ঘরে কত ভরি সোনার গহনা আছে তাহার একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়া গিয়াছে। আর যাহারা নবীনবয়স্ক তাহাদের কেহ বা আপনাপন বন্ধু-বান্ধবীদের দর্শনলাভে আসিয়াছে, কেহবা মুনসেফ-মহিষীকেই দেখিতে আসিয়াছে। মোট কথা সকলেই আনন্দোজ্জ্বল, কেবল সভানেত্রীর মুখ মলিন। স্নো পাউডার ঘষায় মুখখানি ধূসর দেখাইতেছে। আমরা যদি কেহবা সাহিত্যিক হইতাম তবে বনলতার মন ও মুখের বিবর্ণতা লইয়া নানা তুলনা উপমা দ্বারা তাহার জটিল সঙ্কটের অবস্থা বুঝাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু আমরাও সাধারণ দর্শকমাত্র, তাই দেখিতেছি, বনলতা যেন অথৈ জলে পড়িয়াছে এইরূপ মনে করিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া সে কেবল বনশ্রীকে অনুসন্ধান করিতেছিল, যেন সে-ই তাহাকে এ বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করিতে পারে।

নিয়মমতো সভানেত্রী বৃত হইলেন, গলায় মালা পড়িল, বনলতা ক্রমেই মুষড়াইয়া পড়িতে লাগিল। দুই একটি কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ হইল, বনলতার কর্ণে তাহার একটি বর্ণও গেল না। অবশেষে সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত উপস্থিত হইল। বক্তৃতা-মঞ্চের উপরে উঠিতে বনলতার পা কাঁপিতে লাগিল, চক্ষু ভুল দেখিতে লাগিল। মাইক্রোফোনের সম্মুখে যাইতে তাহার বুকের শব্দ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। কি সে বলিবে? যদি সে শুধু চীৎকার করিয়া বলিতে পারিত, আমি লেখিকা নই, লেখকের গৃহিণী, সামান্যা নারী মাত্র, তবেই যেন নিষ্কৃতি পাইত, কিন্তু তাহা সে পারিল না। দুই একবার কাসিয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

সভায় একটা সোরগোলের সৃষ্টি হইল—খিল খিল, খল খল, হি হি, হা হা নানা শব্দের হাসির কোলাহলের মধ্যে পাখা চাই, জল চাই, রব মিলাইয়া গেল। কিন্তু পর মুহূর্তেই দর্শকদের মধ্য হইতে কে একজন মাইক্রোফোনের সামনে যাইয়া বলিল, বন্ধুগণ, বনলতা দেবী কয়েকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। এত ভিড়ের মধ্যে তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবে তিনি আপনাদের কাছে যে সব কথা বলতে এসেছিলেন সেটি লিখে এনেছিলেন, আপনাদের অনুমোদনক্রমে আমি সেটি পড়ে শোনাব।

বনলতা একটু সুস্থ বোধ করিয়া শুনিতে লাগিল, লাউড স্পীকারে বক্তৃতা হইতেছে। তাকাইয়া দেখিল, তাহার স্বামী একখানি এক্সারসাইজ বুক সামনে ধরিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। একবার মাত্র দেখিয়া আবার সে চোখ বন্ধ করিল। এত লজ্জা সে কোথায় লুকাইবে?

লোকে এই বাজারেও কাগজ বাহির করিতে দিবারাত্র পরিশ্রম করে, আর আমি কিনা এই সময়েই কাগজ বন্ধ করিলাম!

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর অফিসে যাইয়া দেখি এক-গাদা পত্র আসিয়াছে—খুলিয়া দেখি সবগুলিই কবিতা। সম্পাদকের আসনে বসিলে এমন লেখা দেখিতে অভ্যস্ত হইতে হয়। কিন্তু অহিফেনসেবীরও মাত্রা যদি একদিন অকস্মাৎ চতুর্গুণ হইয়া পড়ে এবং যদি তাহা ক্রমবর্ধমান হারে চলিতে থাকে তবে তাহার প্রাণের আশা ছাড়িতে হয়। একদিন তাই দেখিলাম আমার টেবিল, আলমারি, দেরাজ, চেয়ার, এমন কি ছেঁড়াকাগজের টুকরিটি পর্যন্ত ভরিয়া উপচিয়া পড়িতেছে—কবিতা, কেবল কবিতা! কেহ কেহ পরামর্শ দিতেছিলেন—সকল লেখকের কাছ হইতে ন্যূনপক্ষে এক মুদ্রা করিয়া চাঁদা তুলিয়া একখানি কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করা হউক। কিন্তু তাহাতেও সে সংগ্রহের কলেবর অষ্টাদশপর্ব মহাভারত ছাড়াইয়া যাইবে আশঙ্কায় বিরত হইলাম।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে আবালবৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়ে যে গুরু আঘাত লাগিয়াছে তাহা কে স্বীকার না করে? কিন্তু মহাকবির তিরোধানকে উপলক্ষ্য করিয়া যদি সকলেই কাস্তে ভাঙিয়া করতাল গড়িতে সুরু করেন তবে তো উদরের ক্রন্দন আরম্ভের পূর্বে কর্ণ-পটহ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। সাধারণে, বিশেষত যাঁহারা কবি-

যশোঃপ্রার্থী হইয়া সম্পাদক কর্তৃক নির্দয়ভাবে অস্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহারা আমার উপর চটিবেন, কিন্তু যে কয়েকজন সম্পাদকের দুর্গ্রহ ভোগ করেন তাঁহারা আমার সহিত মনে মনে তাল দিতেছেন জানি। কিন্তু আমার যে প্রচণ্ড অভিজ্ঞতার কথা এখন বর্ণনা করিব তাহা শুনিয়া তাঁহারাও থ মারিয়া যাইবেন। ঘটনাটা খুলিয়া বলি।

কবিতা-সাগরে ভাসিতেছি ;—হাঁটিতে কবিতা, বসিতে কবিতা, শয়নে কবিতা—এমন কি স্বপ্নেও দেখিতেছিলাম—কবিতার পাহাড় জমিয়া উঠিতেছে। বাংলা দেশে কবির আর অবধি নাই। এই কবিতার বেড়াজাল টপকাইয়া আমার কাগজখানি কেবল প্রবন্ধ ও গল্প লইয়াই এবার বাজারে আত্মপ্রকাশ করিবে, গোপনে গোপনে ইহাই ষড়যন্ত্র করিতেছিলাম। কিন্তু একদিন বালকের হাতে বেলুনের মতো তাহা অনায়াসে ফাঁসিয়া গেল।

ব্যাপারটি আকস্মিক নহে—আমাদের কাছে লেখক, অলেখক, সুলেখক, কুলেখক—এমন কি লেখকের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব অনেকে আসেন। উহা আমাদের সহিয়া গিয়াছে। যখন সম্পাদকের দপ্তরে বসিয়াছি তখনই জানি—আমাদের সময়ের কোনো মূল্যই থাকিতে পারে না, যে যখন আসিবেন আমরা সাক্ষাৎ করিতে এবং হাতের কলম উঁচু করিয়া গল্প করিতে বাধ্য। তাই ভদ্রলোক যখন আমার টেবিলের উপর আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া নমস্কার জানাইলেন, তখন বিরক্ত হইলেও মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কা'কে চাই?

সম্পাদক মশাইকে।

আমিই সম্পাদক, বলতে পারেন।

আ-আমি শশাঙ্কশেখর শীল, একটা গল্প দিয়েছিলাম— আপনার কাগজে প্রকাশের জন্য।

গল্পের নামটি কি?

"ভরা ভাদ্রের নদী।"

গল্পটি সামান্য পড়িয়াই রাখিয়া দিয়াছিলাম, উহা প্রকাশ করিলে পাঠকেরা লেখককে ছাড়িয়া সম্পাদককে গালি দিবেন। তাই বলিলাম—"ডুবে মরবার ভয় আছে—ওটি আমাদের কাগজে চলবে না।"

ভদ্রলোকের মুখে শ্রাবণ-মেঘের ছায়া পড়িল, ভাবিলাম ল্যাঠা বাধাইল, এখনই হয়তো লেখাটি ফেরৎ চাহিবে। কবিতার বন্যায় সে লেখাটি যে কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। কিন্তু লোকটি সত্যই ভদ্র, অর্থাৎ লেখাটি ফেরৎ চাহিল না, লঘু পদবিক্ষেপে ফিরিয়া চলিল। আমি আবার প্রুফ দেখায় মন দিয়াছিলাম, অকস্মাৎ দড়াম্ করিয়া শব্দ হইল—চাহিয়া দেখি দুয়ার গোড়ায় ভদ্রলোক পড়িয়া গেলেন আর উঠিলেন না। অগত্যা আমাকেই উঠিতে হইল এবং চাকরটিকে ডাকিয়া জল, হাওয়া, স্মেলিং সল্ট—ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট কথা সে এক লেজেগোবরে কাণ্ড। ঘণ্টাখানেক পরিশ্রমের পর ভদ্রলোককে পাশের ঘরে শোয়াইয়া কপালের ক্ষতে পটি বাঁধিয়া চাকরটির জিম্মায় রাখিয়া আসিয়া কেবল একখানি চিঠি লিখিতেছি শশাঙ্কশেখরের বাড়িতে খবর দিতে—এমন সময় বীণানিন্দিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—আসতে পারি কি?

বিরক্ত হইব ভাবিলেও ভদ্রতা রক্ষা করিতে হইল। দ্বারে একজন তরুণী। নিখুঁত সুন্দরী না হইলেও 'ভরা ভাদ্রের নদী'

তাহাতে সন্দেহ নাই। সসম্মানে ডাকিতে হইল এবং তিনি আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন এবং রুমালে ঘাড় গলা মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমিই সম্পাদক কি না। আমি সম্পাদক শুনিয়া বলিলেন—আমার নাম তরলা তরফদার, একটি প্রবন্ধ দিয়েছিলাম—'পুরুষের মোহনিদ্রা'—মায়াবাদের শঙ্করভাষ্যের স্তোত্র উদ্ধার করেছিলাম। ওটা কি এই মাসেই যাচ্ছে?

পরিষ্কার 'না' বলিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম—নারী হয়ে আপনি পুরুষের বিষয় কি করে সঠিকভাবে লিখবেন?

তরলা দেবী বলিলেন—কেন, কাগজে দেখেননি, নারীর সম্বন্ধে বড় বড় কথা, নারীর অন্তর্লোকের কথা পুরুষেরাই লিখে থাকেন। তবে আমি কী দোষ করেছি পুরুষের কথা লিখে?

অকাট্য যুক্তি। এবার বলিতেই হইল, প্রবন্ধটি আমাদের মনোনীত হয় নাই।

মহিলা রুখিয়া উঠিলেন—আর শশাঙ্ক শীলের 'ভরা ভাদ্রের নদী' মনোনীত হয়েছে, কেমন? ঐটুকুই মাত্র, তাহার পর তিনি নিস্তেজ হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং রুমালে মুখ চাপিয়া—ফুলিয়া ফুলিয়া সে কি কান্না! তাঁহার শাড়ি দুলিতে লাগিল, তাঁহার কবরী আলুলায়িত হইয়া পড়িল। নারীর একমাত্র সম্বল চোখের জল—তাহাই অঝোরঝোরে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল!

শশাঙ্ক শীল অজ্ঞান হইলেও এতটা বিপন্ন বোধ করি নাই, কিন্তু আমার টেবিলের সম্মুখে একজন অপরিচিতা যুবতী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিবে আর আমি বসিয়া বসিয়া দেখিব বিধাতার এ কী নির্মম পরিহাস! ভাবিতেছিলাম—শশাঙ্ক শীলের গল্পটিও মনোনীত

হয় নাই জানাইয়া দিই, কিন্তু তাহাতে এ শোকোচ্ছাস বাড়িবে কি কমিবে কে জানে? তাই নির্বাক্ হইয়া পলায়নের উপায় চিন্তা করিতেছিলাম। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল—পাশের ঘরে বাবুটি কি বকিতেছেন। যাইয়া দেখি শশাঙ্ক শীল পাশ ফিরিয়া শুইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন আর স্বগতোক্তি করিতেছেন—তরলা তরফদারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে—আর আমার গল্পটা?

আমি যাইয়া তাহার ভুল ভাঙাইতেই সে তড়াক্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—সত্যি সে প্রবন্ধ মনোনীত হয় নি? Thank you, Sir, thank you! লেখা মনোনীত না করিবার জন্য চিরদিন অভিশাপই পাইয়াছি, এমন করিয়া কেহ ধন্যবাদ দেয় নাই।

শশাঙ্কবাবুকে লইয়া যখন বাহিরে আসিলাম, দেখি—মহিলাটিও ধাক্কা সামলাইয়া উঠিয়াছেন এবং রুমালে অক্ষিকোণ মার্জনা করিয়া বিস্রস্ত কেশপাশ সংবদ্ধ করিতেছেন। সহসা পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া তাকাইতেই আমার সঙ্গে শশাঙ্ককে দেখিয়া তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল এবং নমস্কার করিয়া বলিলেন,—মিস্টার শীল যে!

অতঃপর আমাকে আর তাঁহাদের স্মরণ হইল না—উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

এ ঘটনার পরেও কাগজ করিব ভাবিতেছিলাম। কিন্তু যখন মনে পড়িল এখনও আমার অফিসে কবিতার বন্যা বহিতেছে, ঐ কবিকুলের শতাংশ যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া হাজির হন এবং শশাঙ্ক শীলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে থাকেন তবে অফিসে হাসপাতাল খুলিতে হইবে। তাহাপেক্ষা কিছুদিন

অপেক্ষা করাই ভালো। সুতরাং বিজ্ঞাপন দিয়াছি "প্রেসের কর্মচারীদের ইভ্যাকুয়েশনের হিড়িকের জন্য দীর্ঘ অবকাশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া পরবর্তী সংখ্যা একেবারে চৈত্র মাসে প্রকাশিত হইবে।" এবং অফিসের দরজায় বড় একটি তালা ঝুলাইয়া ফড়িয়াপুকুরে বাসা বদলাইয়া অবসর যাপন করিতেছি।

নরোত্তম

ট্রামে যাইতেছিলাম। আমার বাম পাশে পিছনের সীট দখল করিয়া একটি দম্পতি চলিয়াছেন। স্বামীটিকে সুখী মনে হইল, মনে হইল তিনি শান্তিতে আছেন। চেহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মার্জিত, কিন্তু তন্মধ্যে স্বামীটির চেহারা যেন কিছু বিশেষ লক্ষণীয়, যদিও দৃষ্টি তাঁহার দিকে বিশেষ পড়িতেছিল না।

কোনও লোককে লক্ষ্য করিলে আমি মনে মনে তাহার বৃত্তি ও উপার্জনের একটা আনুমানিক হিসাব কষিতে থাকি, ইহা আমার অঙ্কশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানপ্রসূত, কিম্বা মনস্তত্ত্বে অসাধারণ অধিকারবশত নহে। এযাবৎ নিজের উপার্জন সন্তোষজনক হইতেছে না বলিয়াই বোধ হয় সকলের অবস্থার সহিত নিজের তুলনা করিয়া মনে মনে কপাল চাপড়াইতে থাকি।

আজ কিন্তু অধিকক্ষণ এই চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতে পারিলাম না, কারণ ধূমকেতুর মতো উদয় হইল নরোত্তম। নরের মধ্যে সে যে উত্তম সে কথাটা সে সর্বক্ষণ জাহির করিত বলিয়া আমি মনে মনে তাহার উপর বিলক্ষণ বিরক্ত ছিলাম। কিন্তু ট্রাম তো আমার পৈতৃক সম্পত্তি নহে যে তাহাকে নামিয়া যাইতে বলিব। আবার ওদিকে মহাবোধি সোসাইটি হলে সভাটি মাটি হয়—এ ট্রাম ছাড়িয়া দিতেও পারি না, অগত্যা নরোত্তমকে সহ্য করা ছাড়া গত্যন্তর কি?

আমার আসনখানি দুইজনের উপযোগী, আমার দক্ষিণে অপর একজন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, নরোত্তম আমার ঠিক পশ্চাতের

•লেডিজ সীটে বসিয়া পড়িল দেখিয়া বলিলাম—সামনে জায়গা আছে, ও seat-টা meant for ladies.

মুখফোড়ের মতো নরোত্তম বলিল—Don't mind. We are also meant for them.

তাহার কথায় পূর্বোক্ত দম্পতিটি নরোত্তমের দিকে তাকাইয়া পড়িলেন লক্ষ্য করিলাম। ভদ্রলোকের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম—নরোত্তমের হাতে একখানি বাংলা বই, নাম "শীকার সন্ধানে"। পুস্তকখানির কুখ্যাতি রটিয়াছিল, তাই হু হু করিয়া কাটতি হইতেছিল এ খবর রাখিতাম। একটা গুজব রটিয়াছিল, বর্তমান সভ্যসমাজ সম্বন্ধে এমন তীব্র সমালোচনা নাকি অশ্লীল হইয়াছে, অতএব গবর্ণমেণ্ট উহা বাজেয়াপ্ত করিবেন। বলা বাহুল্য, সকলেই গুজব শুনিয়া চট্‌পট্‌ বইখানা কিনিয়া ফেলিতেছিল। এই একখানা বই লিখিয়া গ্রন্থকার শ্রীপ্রমথেশ শাণ্ডিল্য বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। আমি নানা কাগজ খুঁজিয়া তাঁহার কয়েকটি গল্প বাহির করিয়া রাখিয়াছি, ইচ্ছা আছে কাগজের দামটা একটু কমিলেই প্রমথেশবাবুর একখানা গল্পের বই প্রকাশ করিয়া দেখিব ব্যবসায়ে পয়সা আছে কি না! তাই এই প্রমথেশবাবুর চেনাশোনা একজন লোক খুঁজিতেছিলাম, যাহাতে টার্মে গণ্ডগোল না বাধে। নরোত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বইটা কিনলে নাকি?

নরোত্তম 'উহুঁ' না শুধু 'হুঁ' বলিল বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রমথেশবাবুকে চেনো?

নরোত্তম একগাল হাসিল; বলিল—চিনি না কাকে বলো তো। মায় তোমার রবি ঠাকুর থেকে এই প্রমথেশ শাণ্ডিল্য, এই শর্মা না চেনে কাকে! আর এই প্রমথেশ তো একেবারে মানে

আমার বাল্যবন্ধু, বেস্ট ফ্রেণ্ড, তাকে আমি চিনি না তো চেনো তুমি ?

নরোত্তমের হাতে এমন ক্ষমতা আছে, আর আমি কিনা নরোত্তমকে এড়াইয়া চলি ! শাস্ত্রে বলে নাম-মাহাত্ম্য, তা না হইলে নরোত্তম নামের সার্থকতা কি, সে যদি আমাদের মতো সাধারণই হইবে ! নরোত্তমের দিকে ঘুরিয়া বসিয়া আমার অভিপ্রায়টি ব্যক্ত করিলাম। অপর আসনের সেই শান্ত স্বামীটি এক একবার তাকাইতেছিলেন। আমি প্রমথেশবাবুর বেস্ট ফ্রেণ্ড আর বাল্যবন্ধুকে পাইয়া চাপিয়া ধরিলাম, এটা সেটা বলিয়া শেষে তাহার ঠিকানাটি চাহিলাম। নরোত্তম ভবানীপুরের একটি ঠিকানা বলিল।

ট্রাম একদম বাঁধিল—জেনানা লোগ উতরেগা। জেনানা লোগ উঠিলেন, তাঁহার স্বামীটিও উঠিলেন। তারপর আমার দিকে একখানি কার্ড বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—আজ আলাপের সুযোগ হ'ল না, একদিন আসবেন আমার বাড়ি। নরোত্তমকে বলিলেন, আমার বর্তমান ঠিকানা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, আপনার বন্ধুটির সঙ্গে আপনিও যাবেন, একদিন পরিচয় করবার আকাঙ্ক্ষা রইল।

ভদ্রলোক নামিয়া গেলেন।

ট্রাম ছাড়িলে আমি আর নরোত্তম কার্ডখানির উপর ঝুঁকিয়া পড়িলাম, তাহাতে লেখা আছে—

প্রমথেশ শাণ্ডিল্য
১২৮।এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

নরোত্তম চলন্ত ট্রাম হইতে সট্ করিয়া নামিয়া গেল, তাহার বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে কিনা বুঝিতে পারিলাম না।

নসীরাম

অনেক সৌভাগ্যে নসীরামের সন্ধান পাইয়াছিলাম, তাই প্রভু 'জগড়নাথে'র জীবকে আর কালবিলম্ব না করিয়া চলিয়া আসিবার জন্য টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার করিয়া পথখরচ পাঠাইয়া দিলাম।

আসিল অবশ্য পনের দিন পরে, কিন্তু আসিয়াই সে আমার সংসার হাতে তুলিয়া লইল। সংসার বলিতে আমি একা, গৃহিণী ইভ্যাকুয়েশানের হিড়িকে গৃহ ফেলিয়া পিতৃগৃহে গমন করিয়াছেন, আমি নাকের-জলে চোখের-জলে হইতেছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমার দুঃখে বিগলিত হইয়া আপিসের সাধুচরণ তাহার ভাইপো নসীরামের সন্ধান দিয়াছে।

নসীরাম আসিল একটি উজবুকের মতো এবং দুই সপ্তাহে বাবু বনিয়া গেল। কিন্তু সে রাঁধে বেশ, দোষ কেবল নুনের মাত্রা ঠিক থাকে না, কম যেদিন হয়, সেদিন তবু খাওয়া চলে, বেশি যেদিন হয় সেদিন জলে ফেলিয়া দিতে হয়।

তবু নসীরাম রাঁধে ভালো। যখনই যা ফরমায়েস করি তাহাতেই রাজি হয় এবং যেভাবে হউক, যেদিন হউক সে তাহা সমাধা করে। একদিন রবিবারে বেশ চাপিয়া জল আসিয়াছে, নিজের অজ্ঞাতেই খিচুড়ির ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, সময় বা সুযোগাভাবে সেদিন খিচুড়ি হয় নাই, আমি ব্যাপারটি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। দিন তিনেক পরে অফিসে যাইবার

সময় খাইতে বসিয়া দেখি ধূমায়মান একথালা খিচুড়ি হাজির করিয়া নসীরাম দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিতেছে। ক্ষুধায় পিত্ত জ্বলিতেছিল, এবার রাগে জ্বলিল। তবু হাঁকিয়া একখানা পাখা চাহিলাম। দুঃসহ গরমে দ্বিপ্রহরে খিচুড়ি খাইয়া ঘামিতে ঘামিতে ট্রামে যাইয়া বসিয়া নসীরামের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম ; কিন্তু তার পরের দিনের ঘটনায় নসীরামের স্মৃতিশক্তির উপর আমার আস্থা না জন্মিয়া পারিল না, ভাবিতেছি—সে জাতিস্মর হইয়া জন্মে নাই কেন। ব্যাপারটি খুলিয়া বলি—

সকাল সাড়ে সাতটায় অজিত আসিয়াছে, আসিয়াই তাহার হাতের কাগজে বাতাস খাইতে খাইতে বলিল, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারিস ? নসীরাম তখন বাজারে বাহির হইতেছে, তাহাকে এক গ্লাস জল দিতে বলিলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল তবুও সে জল লইয়া আসিল না দেখিয়া নিজেই অজিতকে জল আনিয়া দিলাম। তারপর অজিত উঠিলে তেল মাখিয়া স্নান করিতে গেলাম। স্নান করিয়া আসিয়া দেখি নসীরাম এক গ্লাস জল হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আমাকে দেখিয়াই জলের গ্লাস দাওয়ায় নামাইয়া রাখিয়া বলিল,—'লয়েন কত্তা।' বাজার হইতে ফিরিয়াও সে জলের চাহিদা মিটাইতে ভুল করে নাই।

বারান্দায় 'বাজার' ঢালা রহিয়াছে,—একগাদা পটোল। কি কুক্ষণে বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, আমি পটোল ভাজা ভালোবাসি, সেই অবধি নসীরাম নিত্য পটোল ভাজিতেছে, আমি পটল না তুলিলে যে সে আর পটোল ক্রয় বন্ধ করিবে এমন ভরসা দেখি না।

নসীরামের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া গৃহিণীকে পত্র দিতেছিলাম। এবং শীঘ্র ফিরিয়া আসিবার তাগিদ দিতেছিলাম। আমি যে পাড়ায় থাকি সে পাড়ায় ক্রমে আলো জ্বলিতেছে, শাড়ি শুকাইতেছে, এমন কি এরোপ্লেনের ঘন গর্জন ভেদ করিয়াও করুণ কণ্ঠে 'এমন দিনে তারে বলা যায়' গীত হইতেছে, সুতরাং গৃহিণীও এবার ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার বড়ি আমসত্ত্ব শুকাইতে শুকাইতে পাশের বাড়ির ছাদের সঙ্গে সখীসম্বোধন করিতে পারেন ইত্যাকার নানা প্রলোভন দেখাইতেছিলাম, কিন্তু নিষ্ঠুরা নীরব আছেন। আমার তিনখানি পত্রের শেষে উত্তর আসিল; খুলিয়া দেখি লিখিয়াছেন, "তোমার পত্র অনেকদিন হইল পাই না। আমরা অত্যন্ত চিন্তিত আছি। পত্রপাঠ মাত্র—ইত্যাদি ইত্যাদি"। আসিবার নামগন্ধও নাই।

পত্র পড়িয়া চিন্তিত রহিলাম, আমার চিঠিগুলি খোয়া গেল না ট্রেন লুট হইল। 'পত্রপাঠমাত্র' আর একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া ফেলিলাম এবং অন্তরে যতখানি হা-হুতাশ জমা হইতেছিল তাহার চতুর্গুণ পত্রে জানাইলাম। নসীরাম নিকটেই ছিল, তাহাকে বলিলাম, "চিঠিটা চট্ করে বাক্সে ফেলে দিয়ে আয় দিকি!"

এই পত্র পাইয়া যে গৃহিণী হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিবেন, এবং তাঁহার আমসত্ত্বে পোকা ধরিয়াছে. বড়িতে গুঁড়া গজাইয়াছে দেখিয়া কেমন হতাশার সুরে নাকে কাঁদিতে থাকিবেন তাহারই করুণ চিত্র মনশ্চক্ষে দেখিতে দেখিতে নাভি গহ্বরে তৈল নিষেক করিতেছিলাম, এমন সময় অজিত আসিল, তাহার হাতে আমার সদ্যোলিখিত চিঠির খাম। বলিলাম, এ চিঠি তুই কোথায় পেলি?

তোদের সিঁড়ির কাছে বাক্সে ছেঁড়া কাগজের মধ্যে পড়ে ছিল। সহসা চোখ পড়তে দেখি তোর হাতের লেখা, বৌদির নাম, তুলে আনলাম। তারপর—ব্যাপার কি, খুলে দেখব নাকি?

আমি অজিতের কথার কোনো উত্তর না দিয়া নসীরামকে হাঁকিলাম। নসীরাম আমার জন্য পটোল ভাজিতেছিল, তৈলসিক্ত খুন্তি হাতে আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। বলিলাম, আমার চিঠি ফেললি কোথায়?

নসীরাম বোধ হয় আঁচ করিয়াছিল কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে; তবু দম লইয়া বলিল, ফেলি দিউচি।

চটিয়া গেলাম, বলিলাম—কোন্ ভাগাড়ে 'দিউচি'—ডাস্টবিনে না ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে?

সিঁড়ির কাছে বাক্সে ফেলিয়াছে বলিয়া নসীরাম অকুণ্ঠে স্বীকার করিল। নিজেকে সামলাইতে পারিতেছিলাম না। আমার এমন কাব্য-গাঁথা পত্রগুলি ঐ ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রিজাত করিয়া বেয়াদপ আবার সাধু সাজিতেছে দেখিয়া আমার পিত্ত হইতে প্লীহা যকৃৎ পর্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। অজিত ছিল বলিয়া রক্ষা, সে-ই বুঝাইয়া বলিল, নসীরাম নির্দোষ। বাক্সে ফেলিতে বলিলে সে ডাকবাক্সে ফেলিবার তাৎপর্য বুঝে নাই, ডাকবাক্স কি বা কোথায় তাহাও আমি কোনদিন ইতিপূর্বে তাহাকে দেখাইয়া দিই নাই। সুতরাং আমার প্লীহা যকৃৎ ঠাণ্ডা করা ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। নসীরামের স্মৃতিশক্তির উপর যে আক্রোশ জন্মিয়াছিল এবার তাহার দুর্বুদ্ধি বা বুদ্ধিহীনতার উপর তাহা বর্তাইল।

কিন্তু আমার সে ধারণা পালটাইতেও বিলম্ব হইল না। একদিন সাধুচরণই আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল,—নসীরাম তাহাকে একটি

পয়সাও দিতে চাহিতেছে না। দিন-তিনেক পূর্বে নসারামের বেতন দিয়াছিলাম, সে কথাটি সাধুচরণের কাছে গোপন রাখিবার কোনো প্রয়োজন বোধ করি নাই। কিন্তু সেই কথা জানা অবধি সাধুচরণ টোপ্ ফেলিয়া বেড়াইতেছে, টাকা কয়টি হস্তগত করা দরকার, না হইলে তাহার অভিভাবকত্ব টিকিবে না। বুঝিলাম—মিষ্ট কথা, শিষ্ট বিবেচনা, কোনো পরামর্শই নসীরাম গ্রহণ করিতে রাজি হইতেছে না দেখিয়া সাধুচরণ শেষ ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছে, বলিয়াছে তাহার স্ত্রী অর্থাৎ নসীরামের কাকিমার বাড়াবাড়ি অসুখ—টেলিগ্রাম আসিয়াছে, সাধুচরণকে দেশে যাইতে হইবে। সাধুচরণের হাতে টাকা নাই, নসীরামের টাকাই ভরসা। সাধুচরণ আমার নিকট আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, তাহার স্ত্রীর অসুখ ইত্যাদি। নসীরামকে ডাকাইলাম। সে আসিয়া কাকাকে দেখিয়া রাগে ফুলিয়া উঠিল,—বলিল, বাবু, ওর সব মিথ্যা কথা। কাকিমার অসুখের কথা মিথ্যা। টেলিগ্রাম কোথায় দেখাক্, আমি চিনি না ওকে!

নসীরাম দাঁড়াইল না, ভিতরে যাইয়া সশব্দে সক্রোধে বাসন মাজিতে লাগিল।

সাধুচরণকে বলিলাম, টেলিগ্রাম আছে নাকি তোমার কাছে?

সাধুচরণ ফোঁস করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, ছোঁড়া বয়ে গেল বাবু, কলকাতায় এসেই বয়ে গেল। নইলে বজ্জাৎ বলে কিনা টেলিগেরাপ দেখাও। এত চালাক ও তো আগে ছিল না। এসব কলকাতার চালের গুণ কত্তা, কলকাতার জলহাওয়াই এমনি।

আমার কোনো সমর্থন না পাইয়া সাধুচরণ উঠিয়া গেল।

লম্বা চিঠি

প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকার সিদ্ধহস্ত প্রুফ-রীডার শৈলেশ বাগচীকে আপনারা চেনেন না, আমরা চিনি। নিত্য লম্বা লম্বা প্রুফ দেখিতেই সে অভ্যস্ত, কিন্তু বর্তমানে বেচারী বিবাহ করিয়া বিপদে পড়িয়াছে। সরকারের কল্যাণে যখন পত্রিকার কলেবর কমিতেছে, কাগজের দুর্মূল্যতা তথা দুষ্প্রাপ্যতার দরুন যখন সাপ্তাহিক-মাসিকেরা হু হু করিয়া টাইপ বদল করিতেছে, স্মল পাইকা ছাড়িয়া বর্জইসে অবতরণ করিয়াও কুলাইয়া উঠিতে না পারিয়া সমগ্র পৃষ্ঠার মাপে একখানি করিয়া ব্লক করিলে খরচ পোষাইবে কিনা হিসাব করিতেছে, সেই সময় কিনা শৈলেশের বউ বায়না ধরিতেছে—লম্বা চিঠি চাই, আরো লম্বা, আরো অনেকটা সময় বসিয়া বসিয়া পড়িলেও যাহা শেষ হইবে না।

কথাটা ভাবিয়া শৈলেশের জন্য মায়া হয়—আহা বেচারী বিবাহের পর কয়বারই বা শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, সেই আসিয়া অবধি তো পত্রের প্রত্যাশাতেই তাহার প্রত্যহ ঘুম ভাঙে। পত্র অবশ্য আসে, কিন্তু শৈলেশ প্রত্যেক পত্রেই অনুযোগ শোনে, তাহার চাকুরির অদ্ভুত ছুটিহীনতার জন্য এবং দ্বিতীয়ত, তাহার পত্রের কলেবর-খর্বতার জন্য। যেহেতু চাকুরির উপর চাকুরের কোনো হাত নাই সে কথা বঙ্গমহিলারা ভালোভাবেই জানেন, সেইজন্য প্রথম অভিযোগ শৈলেশ-জায়া বিশেষ দূষণীয় মনে করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় অভিযোগটি গুরুতর। শৈলেশের গত পত্র

মাত্র চার পৃষ্ঠা ছিল, দক্ষিণ-বাড়ির শিখার স্বামী চৌদ্দ পৃষ্ঠা, ললিতার স্বামী সতের পৃষ্ঠা করিয়া পত্র দেয়। সব চেয়ে বড় সংবাদ, তাহার নিজের দাদাই তো তাহার বৌদিকে প্রথমে পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার একখানা রীতিমতো হাতে-লেখা উপন্যাস-পত্র দ্বারা প্রেমসম্ভাষণ জানাইয়াছিলেন। শেষের দৃষ্টান্তটিতে শৈলেশ রীতিমতো ভাবিত হইয়া পড়িল। পঁয়ত্রিশ-পৃষ্ঠা-প্রেমপত্র-লেখা দাদার বোন যে নিদেন পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠার আশা করিতেছে তাহাতে সন্দেহ কি! শৈলেশের রাত্রে ডিউটির পরে দু'একদিন যা'ও বা ঘুম আসিতেছিল, তাহাও বন্ধ হইল।

কিন্তু বিবাহ যখন করিয়াই ফেলিয়াছে তখন আর উপায় কি, অগত্যা সকাল সকাল স্নানাহার সারিয়া মেঝেতে মাদুর পাতিয়া বুকে বালিস দিয়া কাগজ কলম লইয়া শৈলেশ পত্র লিখিতে বসিল। তাহার কলম ছুটিতেছে, ছুটিতেছে, ছুটিতেছে। ক্রমে তাহা কলিকাতা ছাড়াইয়া বঙ্গোপসাগর, পথে চট্টগ্রাম ও আসামের বোমা-বিধ্বস্ত অঞ্চল, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান, জার্মানি, রাশিয়া, ওয়াশিংটন, এলাহাবাদ, ওয়ার্দা ঘুরিয়া খুলনা জেলার মূলঘর নামক ছোট একটি গ্রামে যাইয়া থামিল। এই ছুটাছুটিতে তাহার কলম পূরাপূরি ছয়টি পৃষ্ঠা পার হইয়া আসিয়া সপ্তমের মাঝা-মাঝি মূলঘরে পৌঁছিল। এই সাড়ে ছয় পৃষ্ঠার কলমবাজিতে সে প্রমাণ করিয়া দিল, সে কলিকাতায় আছে বলিয়া বিশ্বের এই গুরুতর পরিস্থিতির সংবাদ দেশবাসী যথা সময়ে জানিতে পারিতেছে। সে কলিকাতায় না থাকিলে কবে সংবাদপত্র-প্রকাশ বন্ধ হইয়া যাইত এবং লোকেরা সময় থাকিতে যুদ্ধের আতঙ্কে কলিকাতা ছাড়িয়া মফস্বলে পলাইতে পারিত না এবং মফস্বলে

যাইয়া ভিড় না করিলে তাহাদের অসুখবিসুখের এমন হিড়িক পড়িত না। অতএব শ্বশুর মহাশয় (শৈলেশের শ্বশুর ডাক্তার) যে বর্তমানে বেশ দু' পয়সা কামাইতেছেন তাহার মূলেও এই শর্মা—শ্রীমান্ শৈলেশ বাগচী। অতএব এমন স্বামী লাভের গর্বে শৈলেশ-জায়া উল্লসিত হইতে পারিবেন এই আশ্বস্তিতে শৈলেশের কলম সেই সাড়ে ছয় পৃষ্ঠার উপর আড় হইয়া পড়িয়া একটু আলস্য উপভোগ করিতে লাগিল। রাত্রিজাগরণ-ক্লিষ্ট শৈলেশ সেই সপ্তম পৃষ্ঠার উপর অঘোরে ঘুমাইতে লাগিল। যখন ঘুম ভাঙিল তখন্ আর একটি লাইনও লিখিবার সময় নাই, অফিস যাইবার পথে পত্রটি সে ডাকঘরে ফেলিয়া দিয়া গেল।

বলা বাহুল্য সে পত্রের উত্তরেও দ্বিতীয় অভিযোগটি আসিল। মোটে ছয় পৃষ্ঠা, অপর অর্ধ পৃষ্ঠা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

শৈলেশের একজন সহপাঠী শৈলেশকে মাঝে মাঝে পত্র লিখিত, সে পত্রের মধ্যে কবিতার কলি তুলিয়া পত্র মনোজ্ঞ করিতে চাহিত। সহসা কথাটা মনে পড়িতেই শৈলেশ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল, কবিতার দ্বারা ভাবসম্প্রসারণ সম্ভব না হউক অন্তত স্থানসম্প্রসারণ হইবে, এবং তাহাই তো সে চায়। অন্তত চৌদ্দ পৃষ্ঠা চিঠি না দিলে এবার আর মান থাকে না, অতএব শৈলেশ কবিতার কলি সংগ্রহে তৎপর হইয়া কয়েকটি শ্লোক সংগ্রহ করিল; যথা—

একটুকু হাওয়া লাগে, একটু বা ঘুমে ঢুলি,
তাই নিয়ে কোনো ভাবে দেখিতেছি প্রুফগুলি।
কিছু সিগারের নেশা, কিছু বা স্বপ্নে মেশা,
তাই নিয়ে সযতনে দাঁতে চাপি অঙ্গুলি।
একটু বা হাওয়া লাগে, একটু বা ঘুমে ঢুলি॥

এইরূপে অফিসের কাজের বর্ণনা সারিয়া গৃহে ফিরিয়া কী চিন্তা করা হয় তাহার বর্ণনা, যথা—

এমন দিনে বাড়ি যাওয়া যায়,
এমন ফাল্গুন হাওয়া হায়।
এমন রজনীতে, তেতলা ছাদটিতে
মিলন-পূর্ণিমা জ্যোছনায়।

ছাদে জ্যোৎস্নায় কী তর্কাতর্কি ও রহস্যালাপ হইবে তাহার বর্ণনা, যথা—

সে কথা জানিবে না কেহ আর,
শিখার স্বামী, কিম্বা ললিতার।
দুজনে মুখোমুখি, খেলিব লুকোলুকি
পড়িব ধরা তবু অনিবার।
বলিবে—আসিবে না শনিবার?

কবিতার উদ্ধৃতির দুপাশে যথেষ্ট সাদা কাগজ বাদ রহিল, তবুও চিঠি তের পৃষ্ঠা পার হইল না। ভয়ে ভয়ে ডাকে ছাড়িয়া শৈলেশ উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিল। উত্তর সেই এক—'তুমি পারলে না আরো লম্বা চিঠি লিখতে, যা আমার সখী শিখা ও ললিতাকে দেখাতে পারি।' সর্বনাশ, শৈলেশের মাথায় কে যেন সোডাওয়াটারের বোতলের ছিপি খুলিল, তেমনি বুদ্বুদ উঠিতেছে, ফুটিতেছে, উঠিতেছে, আরো উঠিতেছে, আরো উঠিতেছে, শত প্রশ্নের বুদ্বুদ—তবে শিখা ও ললিতা শৈলেশের এই পত্রখানিও পড়িয়াছে, এবং না জানি কি নিদারুণ হাসাহাসি করিয়াছে! সে আবার কেন কবিত্ব করিয়া লিখিতে গেল যে তাহাদের মিলনরজনীর কথা শিখা কিম্বা ললিতার স্বামী

জানিতে পারিবে না। যদিও জানিতে পারিত না, এই চিঠি পড়িয়া থাকিলে শিখা এবং ললিতা নিশ্চয় তাহাদের স্ব স্ব স্বামীর নিকট এই কথা বলিয়া কত হাসাহাসি করিয়াছে। কলিকাতার নির্জন মেসঘরে আর একটি অসহায় স্বামীর মগজের মধ্যে সন্তুছিপিযুক্ত সোডা ওয়াটারের বোতলের বুদ্বুদ উঠিতে লাগিল।

এই নিদারুণ বিংশ শতাব্দীতেও যে ভগবান্ আছেন এবং নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়া 'কল' দিলে বোমার ভয়ের মধ্যেও যে কলিকাতায় আসিয়া থাকেন তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল, যখন শৈলেশ পরদিন হৃষ্ট মনে অফিস হইতে মেসে ফিরিয়া আসিল। ঘরে ঢুকিয়াই সে দ্বার বন্ধ করিল, আর খুলিল একদিন পরে।

তার পরের দিন শৈলেশ-জায়া পত্র পাইলেন। পত্রের শিরোনামায় লেখা, 'লম্বা চিঠি'। চিঠিখানি ভাঁজ না করিয়া ফিলমের মত জড়ানো, যতই পাক খুলেন ততই চিঠি বাহির হইয়া আসে, যেন ম্যাজিকের ব্যাপার। মহাভারতোক্ত দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের উপাখ্যান শৈলেশ-জায়া স্মরণ করিলেন। সম্পূর্ণ চিঠি খুলিতে তাঁহার এক ঘণ্টা লাগিল এবং এক দুপুরেও পড়া শেষ হইল না। চিঠিটি ত্রিশ হাত লম্বা।

শৈলেশ লম্বা চিঠির জন্য আর অনুযোগ শুনে নাই। এ যে সাক্ষাৎ স্বপ্নাদ্য ঔষধ, না হইলে খবরের কাগজের 'কলম'-এর মতো সরু করিয়া কাটা কাগজ ঘুড়ির লেজের মতো লেই দিয়া জুড়িয়া লইলেই কি 'লম্বা চিঠি' হয়? সত্যই বিপদের দিনে ভগবান আছেন।

ভোজ-প্রবন্ধ

রাঁচির গার্ডেনার হোটেলে আট নম্বর ঘরে আস্তানা নিয়েছি; কাঁকে যাওয়ার পথে এরোপ্লেনের মতো বাড়িখানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম এক ভদ্রলোককে। চেনা চেনা মনে হ'ল, কিন্তু নামটা মনে হওয়ার আগেই আমার সাইকেল রিক্শ' এগিয়ে গেল।

পাগলা গারদ ঘুরে ঘরে ফিরতে রাত হ'ল। এসে দেখি হোটেলের বারান্দায় পাতা পড়েছে, বাবুদের ডাক পড়ছে। কুয়োর জলে হাত-পা ধুয়ে আমিও বসে পড়লাম।

খাওয়া সেরে ঘরে ফিরে দেখি, আমার খাটের পাশের বাসিন্দাটি ইতিমধ্যেই শয্যা গ্রহণ করেছেন। আহারাদি যে সমাপ্ত হয়েছে তা তাঁর উদরের পরিধি দেখেই বোঝা যায়, একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল তাঁর উদার উদ্গার শুনে। টিপয়ের উপর রক্ষিত চার খিলি পান, কাঁচি সিগ্রেটের প্যাকেটের পাশে একটা আধখোলা দেশলাই। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম, তিনি শুয়ে শুয়ে একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খুট্‌ছেন।

আমার সাড়া পেয়ে পাশ ফেরবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না, হোটেলের মূল্যবান্ তক্তপোষখানাই ক্যাঁচ কোঁচ করে আপত্তি জানালে। অগত্যা চিৎ হয়ে শুয়েই তিনি চীৎকার করে উঠলেন: দাদা এলেন নাকি?

ঘরে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই, সুতরাং দাদা সম্বোধনে আমাকেই আপ্যায়ন করা হচ্ছে বুঝতে পারলাম। উত্তর দিতে দ্বিধা হতে লাগল। যিনি এমন সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছেন তাঁকে ইতিপূর্বে কোনদিন দেখেছি কিনা জানি না। আজ এ ঘরে যখন বাক্স-বিছানা তুলেছি তখন এ ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি, খাটখানা খালিই ছিল তখন। অগত্যা আর কি বলা যায় ভেবে না পেয়ে বল্লাম : আপনি কখন এলেন ?

কষ্ট করে কাৎ হয়ে এক নজর দেখে নিলেন তিনি, তারপর তেমনি উদার গলায় হাঁক দিলেন, যেন কাউকে ডেকে কিছু বললেন : হাজারিবাগ থেকে এলাম, তারপর, খবর সব কুশল তো ?

আমাকে বেশ চেনা চেনা মনে হচ্ছে নাকি ?—সোজাসুজি না জিজ্ঞাসা করে পারলাম না।

'দাদা' সম্বোধন ছেড়ে এবার 'ব্রাদারে' নামলেন তিনি, বললেন, এত সহজে ভুলব কেন ব্রাদার। সেই যে ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ায় চিঁড়ে-ঘোল খাইয়েছিলে, তুমি সেই ইষ্টো বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যানভাসার তো ?

আমারও ভুল ভাঙল এতক্ষণে। মুখের চেয়ে বুক, তার চেয়ে উদর উঁচু হয়ে আছে ; আর কথার গমকে সেই বিরাট মেদপিণ্ড দুলছে। সেইদিকেই এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম, মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তে চিনলাম—এই ভদ্রলোককেই কাঁকের পথে অর্জুন রায়ের 'Par Avion' বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে আজ দেখেছি বটে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আর গেছ নাকি ভায়া ?—দাদা জিজ্ঞাসা করলেন। বল্লাম—আজ্ঞে না, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আর যাওয়া হয়নি।

সুযোগ পেলেই যেও ব্রাদার, অমন ঘন ঘোল ভূ-ভারতে কোথাও পাবে না। আর উঠবে ওই নকুড় শাহার হোটেলে। আমার নাম কোরো, যত্ন-আত্তি করবে। ফি বছর শীতকালে আমি নকুড়ের হোটেলে যাই কচ্ছপের মাংস খেতে। অমন কচ্ছপও আর কোথাও পাবে না।

মনে পড়ল আমার। নকুড় শাহার ছোট হোটেলের গোটা চেহারাটাই আমার মনে পড়ে গেল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মতো জায়গা, খুঁজে পেতে দেরি হয় না। স্টেশন থেকে যে পথটা শহরে এসেছে তার একটা কুচো গলির উপর হোটেলের চালা-ঘর, গোলপাতায় ছাওয়া। রাস্তার দিকের ঝাপ খোলা, ঘরের দুধারে তক্তপোষের একঢালা বিছানা, উপরে হোগলার চাঁছ বিছানো, বেড়ার পাশে পাশে সাত-আটখানা মশারি দু'খুটে দোলনার মতো ঝুলছে, নিচে ময়লা বিছানা জড়ো করা। হোটেলে খরিদ্দার আছে, তার নিশানা। দুপাশে বিছানার সারি, মাঝ দিয়ে পথ গেছে ভিতরের দিকে। একেবারে শেষ কিনারে নকুড় শাহার নিজের তক্তপোষ। গলায় কন্ঠি, হাতে থেলো হুঁকো, হাত-বাক্স কোলে নিয়ে নকুড় বসে হিসাবের খাতা লেখে, আর হাঁকডাক করে তত্বতল্লাস নেয়। বেড়ায় ঝুলানো চার পাঁচটা হুঁকা, ব্রাহ্মণেরটায় কড়ি বাঁধা।

নকুড়ের তক্তপোষের শেষ কিনারে আর একখানা লম্বা চালাঘর,—হোটেলের ডাইনিং হল। দু'ধারে এবং মাঝে পিঠা-পিঠি দুলাইনে ৬০ জন লোক খেতে বসতে পারে। সেই ঘরের বাইরে আর একখানা চালাঘর, তার মধ্যে পাঁচখানা পৃথক তক্তপোষ, তলায় ইট দিয়ে পায়া দেড় হাত উঁচু করা

হয়েছে। তক্তপোষের তলাভর্তি তরকারির ঝুড়ি, তেলের টিন প্রভৃতি। তক্তপোষের উপরটা দৈনিক আট আনা ভাড়ায় মুরুব্বি ধরনের খরিদ্দারদের দেওয়া হয়। এই ঘরের আর একটা কামরা আছে; কানাঘুষায় জানা গেল, সেটা নকুড়চন্দ্রের তৃতীয় পক্ষের খাসমহল। রান্নার চালাটা সেই কামরার কাছে।

হোটেলের সম্মুখে একজন দালাল খাড়া ছিল, তাই আমি অক্লেশে গ্রাণ্ডো হোটেলের সুমুখে আমার সাইকেল রিকশ' দাঁড় করাতে বলতে পেরেছিলাম। ছোট্ট একখানা আলকাতরা মাখা টিনে 'গ্রাণ্ডো হোটেল, প্রোপ্রাইটর শ্রীনকুড়চন্দ্র শাহা' লেখা, নিকটের একটা জিয়ল গাছে ঝুলছে। দালাল হাঁক দিচ্ছেঃ গ্রাণ্ডো হোটেল, গ্রাণ্ডো হোটেল—পাকা পায়খানা, খাবেন ভালো। চলে আসুন বাবুরা।

দাদার সঙ্গে দেখা হ'ল ডাইনিং হলে। একটা বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়ে তিনি কায়েমি হয়ে ব'সেছিলেন, আমি খেতে বসবার পরেও তিনবার মাংস চেয়েছিলেন। আমি খাওয়া সেরে নকুড়চন্দ্রের গদিতে বসে গতদিনের দৈনিক বসুমতীর পাতা ওলটাচ্ছি, তখনও তিনি ঠাকুরের সঙ্গে মাংস নিয়ে বচসা করছেন। বচসার স্বরগ্রাম উচ্চ হতে উচ্চতর হচ্ছে দেখে নকুড় হাতের হুঁকো নামিয়ে হাঁক দিলেঃ বাঁড়ুজ্জে মশায়, কি হ'ল আবার!

বাঁড়ুজ্জে মশাই বল্লেন,—একটুখানি মাংস চাইছি শা'মশাই। কাউঠার মাংস তুমি ভালো খাওয়াও, তাই হিল্লি-দিল্লী ঘুরেও এই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আসি তোমার গ্রাণ্ডো হোটেলে। এমন মাংস আর ভূভারতে নেই।

শুয়ে শুয়ে সেদিন আলাপ হয়েছিল, পরদিন বাজারে বাঁড়ুজ্জে মশাইকে পেয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিখ্যাত ঘোল-চিঁড়ে খাওয়াতে নিয়ে গেলাম। দোকানদার আমাদের যত্ন করে বসালে, ঘরের মেঝেতে জল ছিটিয়ে কলাপাতা বিছিয়ে দিলে। পরে জানলাম, বাঁড়ুজ্জে মশাইকে তারা জানে, পরের পয়সার তিনি অমর্যাদা করেন না। ঘোল সেদিনও আড়াই সের-টাক খেলেন, সঙ্গে একসের সন্দেশ। পেটটা ভালো যাচ্ছিল না বলে আধসেরের বেশি চিঁড়ে নিলেন না।

সেই বাঁড়ুজ্জে মশাই আমার সুমুখে শুয়ে আছেন। তাঁর চেহারার সঙ্গে তাঁর অনেক উপদেশ আমার মনে পড়ল। চট্টগ্রামে শ্রীদুর্গা, ঢাকায় 'ও-কে' রেস্টুরেণ্ট, জব্বলপুরে স্ট'ার', পুরীতে 'বীচবাউণ্ড'—হোটেলগুলির নাম তাঁর কণ্ঠস্থ। গোটা ভারতবর্ষে কোথায় কোন্ হোটেলে সস্তায় ভরপেট লুচিমাংস খাওয়ায় বল্লে বলতে সুরু করবেন,—শিলিগুড়ির সিসিল হোটেল, জলপাইগুড়ির 'হিন্দু লজ', হতে হতে থামবেন গিয়ে বোম্বাইয়ের রয়্যাল বেঙ্গল, ল্যামিংটন রোড; বোম্বাই—৪। শুধু কি তাই, বোম্বাই-এর মুখুজ্জে মশাই, পুনায় দবেজি, অমৃতসহরে গুরনামসিং, দ্বারকায় হিরদয়লাল—হোটেলওয়ালার ঠিক ঠিক নামগুলোও তাঁর মুখস্থ। এমন যে ছত্রিশগড় রায়পুর—সেখানকার কোনো কেচ্ছা-কাহিনীতেও বাঁড়ুজ্জে মশাইকে বাঁধতে পারেনি। বরং ভুষা-ওয়ালের কলার কাহিনী তাঁর মুখে যে না শুনেছে সে বাঁড়ুজ্জে মশাইকে দেখে নি। ভ্রমণ তাঁর পেশা, ভোজন তাঁর নেশা; সে নেশায় পাগল হয়ে গোটা ভারতবর্ষ চক্কর দিয়ে বেড়ান। কৃষ্ণনগরের সরভাজা, বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা, জয়নগরের

মোয়া কিম্বা বাগবাজারের রসগোল্লায় তাঁর মন ভেজে না। তিনি প্রকৃত ভোজন-রসিক—প্রকারে ও পরিমাণে। তাই দাক্ষিণাত্যের তিন্তিড়ি, মহারাষ্ট্রের দধিবড়া, গুর্জরের পকৌড়ি কিম্বা মারওয়াড়ের মেওয়ার স্বাদ কোন্ মৌসুমে কেমন খোলে, সব তাঁর জিহ্বাগ্রে।

বাঁড়ুজ্জে মশাই আর একটা উদার উদ্গার তুললেন, তারপর বললেন, আজ চাটনিটা কেমন লাগলো ?

চাটনি খেয়েছিলাম কিনা স্মরণ ছিল না, বল্লাম—ভালোই।

ভালোই কি হে ! যে যে ফরমুলায় রাঁধবার পরামর্শ দিলাম তা এদের ঠাকুর করে উঠতে পারল না, মাঝে থেকে আমার একসের আলুবোখরা মাটি ! গার্ডেনার মানে মালীর হোটেল কিনা, তাই এই অবস্থা। থাকত বেঁচে সতীশ সরখেল—দেখাতো রেঁধে চাটনি কাকে বলে। একবার এক চীনে সায়েবকে এ্যায়সা কায়দা করে তেলাপোকার চাটনি রেঁধে খাওয়ালে যে, তার আর দেশে ফেরাই হলো না।

রাঁচীতে থেকে গেলে বুঝি ?—না জিজ্ঞাসা করে পারলাম না।

বাঁড়ুজ্জে মশাই বললেন ঃ পাগল ! বিহারীদের দৌরাত্ম্যে বাঙালীরই এখানে জায়গা হয় না, তায় আবার চীনে। সোজা ওপারে চলে গেল আর কি !

তাইতো রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন ঃ

ওজন করি ভোজন করা
তাহারে করি ঘৃণা,
মরণভীরু একথা বুঝিবি না॥

ওহে ভোজনের জন্যই জন্ম ; ভোজনের জন্যই এই বিচিত্র কর্ম-প্রচেষ্টা !

কবিগুরুকেও এই কোটেশন-শায়কে আঘাত হানতে ছাড়ছেন না দেখে আমি হাল ছাড়লাম, বাঁড়ুজ্জে মশাইকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে আমি সিনেমার পথে পা বাড়ালাম।

শেষ